দাম : বারো টাকা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
ধর্মীয় গোঁড়ামি দেশের
সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক
— পৃঃ ১৩

স্বস্তিকা

ভারতবর্ষে হালাল
সার্টিফিকেশন এক
সমান্তরাল অর্থব্যবস্থা
— পৃঃ ৩৫

৭৪ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা।। ২১ মার্চ, ২০২২।। ৬ চৈত্র - ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

সফল অপারেশন গঙ্গা

- বিশ্বের বাকি দেশগুলো যখন রীতিমতো দিশাহারা, তখন ভারত জরুরি ভিত্তিতে ইউক্রেন থেকে ফিরিয়ে আনল ভারতীয় ছাত্রদের।
- সম্পূর্ণ সরকারি খরচায়, সরকারি আতিথেয়তায় ছাত্রদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার।

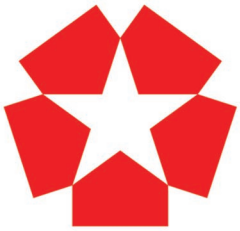

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®

CENTURYLAMINATES®

CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM®

CENTURYMDF®

CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ৬ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২১ মার্চ - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

উভয় সংকটে মমতা 'ডাঙ্গায় কেজরি জলে সোনিয়া' ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

যোগীজী আপনি বড্ড বোকা ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ জয় এনে দিল উত্তরপ্রদেশে ◻ স্বামীনাথন আইয়ার ◻ ৮

কংগ্রেসি-চিন্তা মুক্ত ভারত ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

আচার্য চাণক্য কুটিল নীতির নয়, রাষ্ট্র নির্মাণের স্রষ্টা ◻ কাশ্যপ সেনগুপ্ত ◻ ১১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় গোঁড়ামি দেশের সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক ◻ রঞ্জন কুমার দে ◻ ১৩

ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম! এই বিভ্রান্তি দূর হওয়া প্রয়োজন ◻ ড. রাকেশ দাশ ◻ ১৫

বীর সাভারকরের সংগ্রামী জীবনের মূল্যায়ন খুবই জরুরি ◻ ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ◻ ১৮

সাক্ষাৎকার : প্রমাণ হলো ভারত এখন অপ্রতিরোধ্য : কর্নেল সব্যসাচী বাগচী ◻ অনামিকা দে ◻ ২৩

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটানোই হবে ভারতের আশু কর্তব্য ◻ সুজিত রায় ◻ ২৪

মোদীর বিদেশ ভ্রমণেই পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য ◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ২৬

চিরপথিক এক দার্শনিকের সন্ধানে ◻ কৌশিক রায় ◻ ৩১

মাতঙ্গিনী হাজরা ◻ সুতপা বসাক ভড় ◻ ৩২

বারবার আক্রান্ত হয়েও অবিচল সোমনাথ ◻ সূর্য শেখর হালদার ◻ ৩৩

ভারতবর্ষে হালাল সার্টিফিকেট এক সমান্তরাল অর্থব্যবস্থা ◻ ড. প্রদোষ রঞ্জন ঘোষ ◻ ৩৫

করোনার কারণে সমাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ন্যাটোর বাড়ি থেকে যুদ্ধ ◻ শিতাংশু গুহ ◻ ৩৮

রাশিয়ায় বিপ্লব সফল করার জন্য অর্থ জুগিয়েছিল জর্মানি ◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ৪৪

নারীকে খাঁচায় বন্দি করে রাখলে পিছিয়ে পড়বে বিশ্ব ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ অন্যরকম : ৪৩ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯

প্রকাশিত হবে
২৮ মার্চ
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৮ মার্চ
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

দি কাশ্মীর ফাইলস

রালিভ, সালিভ, গালিভ। কাশ্মীরি ভাষায় এই তিনটি শব্দের অর্থ হয় মুসলমান হও, নয়তো কাশ্মীর ছেড়ে পালাও, অন্যথায় মরো। ১৯৯০ সালে প্রথম এই তিনটি শব্দ আছড়ে পড়েছিল কাশ্মীরের অলিতে-গলিতে। নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল মুসলমান না হতে চাওয়া কাশ্মীরি পণ্ডিতদের। অবাধ লুণ্ঠন ও নারী ধর্ষণে নরক হয়ে উঠেছিল ভূস্বর্গ। এই ঘটনার কথা মানুষ যাতে জানতে না পারে তার জন্য সর্বতোভাবে সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন দেশের তৎকালীন ক্ষমতাসীনরা। 'দি কাশ্মীর ফাইলস' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন কাশ্মীরের অমুসলমান মানুষগুলোর প্রতি ঘটে যাওয়া অমানবিক, নৃশংস সত্যি ঘটনাগুলো নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকছে এই ছায়াছবি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ আবেদন

প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পাঠানো সত্ত্বেও ডাকযোগে বহু গ্রাহকই স্বস্তিকা ঠিকমতো পাচ্ছেন না— এরকম অভিযোগ আমরা হামেশাই পাচ্ছি। এবিষয়ে ডাকবিভাগে যোগাযোগ করেও কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

তাই, আমরা রেজিস্ট্রি পোস্টের মাধ্যমে স্বস্তিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। যাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ বহন করতে আগ্রহী তাঁরা রেজিস্ট্রি খরচ কার্যালয়ে জমা দিলে আমরা তাঁদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকের মাধ্যমে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।

রেজিস্ট্রি খরচ—

প্রতি সপ্তাহে ২২.০০ টাকা।

এক মাসের পত্রিকা একসঙ্গে পাঠালে ৩০.০০ টাকা।

(বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ছাড়াও এই রেজিস্ট্রি খরচ অতিরিক্ত দিতে হবে।)

—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক

কোনো রাষ্ট্র প্রধান যখন নিজেকে সেই রাষ্ট্রের প্রধান সেবক হিসাবে পরিণত করিতে পারেন, সেই রাষ্ট্রের অধিবাসীরাও তখন পরম নিশ্চিন্তে তাঁহার উপর ভরসা করিতে পারেন। দেশের প্রতিপক্ষ দল এবং দেশবিরোধী শক্তি যতই তাঁহার বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার এবং ষড়যন্ত্র করিয়া দেশবাসীর মন ভাঙাইবার চেষ্টা করুক না কেন তাহাতে তাহারা কোনোভাবেই সফল হইতে পারে না। বর্তমান ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে ইহা শত প্রতিশত প্রযোজ্য। নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইবার পর দেশবাসী তাঁহার মধ্যে বহু বৎসর পর একজন প্রকৃত রাষ্ট্রনায়কের প্রতিচ্ছবি দর্শন করিতেছে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করিয়া সংসদ ভবনে প্রবেশ করিবার সময় তিনি যেইভাবে গণতন্ত্রের মন্দিরকে প্রণিপাত করিয়াছেন, সেই মুহূর্তেই তিনি দেশের মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থান করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার উপর দেশবাসীর বিশ্বাস এত দৃঢ় হইয়াছে বলিয়াই তাহারা নির্দ্বিধাই বলিতে পারিতেছে যে, 'মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'। তাহার পর দেশবাসী তাঁহার একের পর এক সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছে— ৩৭০ ধারা বাতিল করিয়া কাশ্মীরকে ভারতের মূল ধারার সহিত যুক্ত করা, সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে অযোধ্যায় রামমন্দিরের অধিকার হিন্দুদিগের হাতে আসিবার পর তথায় শিলান্যাসে অংশগ্রহণ করা, মুসলমান মহিলাদের মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথা তিন তালাক নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি। দেশের মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবাসীর বিকাশ এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার স্বার্থে যাহা কিছু করণীয় তাহা তিনি সবই করিবেন। করোনা মহামারীকালে দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য যাহা কিছু তিনি করিয়াছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-সহ সমগ্র বিশ্ব তাহার প্রশংসা করিয়াছে। সমগ্র বিশ্বে কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করিয়া তিনি বিশ্বনেতার স্তরে উন্নীত হইয়া বিশ্ব দরবারে অবিসংবাদী নেতা রূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইউক্রেন-রাশিয়া যুযুধান দুই পক্ষই চাহিতেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায়। এই যুদ্ধেই আর একবার প্রমাণ হইল বিশ্ব দরবারে ভারতের প্রভাব কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বলিয়াছেন, বিশ্বে ভারতের প্রভাব কতটা তাহার জলজ্যান্ত প্রমাণ হইল অপারেশন গঙ্গা। ভারতীয় পড়ুয়াদের উদ্ধার অভিযানকে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে অপারেশন গঙ্গা নাম দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন হইতে ২৩ হাজার ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীকে উদ্ধারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কথায় দুই যুদ্ধরত পক্ষই কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি রাখিয়াছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশ যখন তাহাদের দেশের নাগরিকদের নিজের দেশে ফিরাইতে নাজেহাল, তখন ভারত সরকার তাহার কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রভাবে অতি সহজেই সেই কার্য সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছে। ভারত সরকারের চার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সহ বিদেশ সচিব সশরীরে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে উপস্থিত থাকিয়া ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমানে মাত্র চৌদ্দদিনে তেইশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে দেশে ফিরাইয়া আনিতে সফল হইয়াছেন।

ভারত সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগে যখন দেশের মানুষ প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন কংগ্রেস- সহ বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর নিন্দায় সমালোচনায় মুখর হইয়াছেন। অন্যান্য বারের মতো এইবারও তাহারা নানাভাবে প্রধানমন্ত্রীকে কালিমালিপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেইসব সমালোচনায় বিচলিত না হইয়া তাঁহার কর্তব্যে অবিচল থাকিয়াছেন। সমালোচনার জবাব দিবার সময় তাঁহার বা তাঁহার সরকারের নাই। তিনি এবং তাঁহার সরকার দেশের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ। সবচাইতে বড়ো কথা, দেশের মানুষের জন্য তিনি কাজ করিতেছেন,দেশের মানুষ তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে। ভারতবাসীর মহাভাগ্য যে তাহারা দেশের কর্ণধার রূপে একজন প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ককে পাইয়াছে। যাঁহার দেশহিতৈষী কার্যকলাপ পদে পদে অবলোকন করিতেছে ভূভারত।

সুভাষিতম্

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্বদা।

কামক্রোধৌ বশে যস্য স সাধুঃ কথ্যতে বুধৈঃ।।

কেবল সত্যই যাঁর ব্রত, যিনি সর্বদা দীনদুঃখীর সেবা করেন, কাম-ক্রোধ যাঁর বশে থাকে, তাঁকে জ্ঞানী লোকেরা সাধু বলেন।

উভয় সংকটে মমতা
ডাঙায় কেজরি, জলে সোনিয়া

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

হিসাব মতো পাঁচের ভিতর চার রাজ্যেই দামামা বাজিয়ে বিধানসভা নির্বাচন জিতেছে বিজেপি। ১২টি নির্বাচন সমীক্ষা আগেই জানিয়েছিল বিজেপি রমরম করে ৫-এর ভিতর ৪-রাজ্য জিতবে আর ৯টি জানিয়েছিল পঞ্জাবে জিতবে আপ বা আম আদমি পার্টি। কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে দেশের রাজনৈতিক ম্যাপ থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাবে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর ভারত 'কংগ্রেস মুক্ত' হবে। এখন তিনটি রাজ্যে শরিক ধরে আর দু'টিতে একক ভাবে রয়েছে কংগ্রেস। বিজেপি ১২ আর শরিক-সহ ১৮।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা পঞ্জাবে আম আদমির উত্থান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শিরঃপীড়া হবে। তারা নিশ্চিত যে ২০২৪-এ লোকসভা ভোটে নরেন্দ্র মোদীর বিরোধী মুখ হতে পারেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অবশ্য নরেন্দ্র মোদী যদি সেই ভোট লড়েন তবেই। মমতার তাই উভয় সংকট। ডাঙায় কেজরিওয়াল। জলে সোনিয়া। মমতার এখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা। এছাড়া বিজেপির সঙ্গে তাঁর গাঁটছড়া-বোঝাপড়া বা সেটিঙের বদনাম তো আছেই। তবে মমতার স্বস্তি রাহুল সোনিয়া নিজেরাই ডুবতে বসেছে। তাই মমতা ভাবতেই পারেন কংগ্রেসের সঙ্গে জোড়া তালি দিয়ে যদি পুনরায় সম্পর্ক গড়া যায়। তাতে অন্তত কেজরিওয়ালকে আটকানো যাবে।

বিশ্লেষকদের বক্তব্য : মমতার নতুন অ্যালার্জি কংগ্রেস বা সোনিয়া নয়। তার নাম অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আপ জানিয়েছে ২০২৩-এ রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা লড়বে। এ বছরের শেষে হিমাচলপ্রদেশ নির্বাচনেও আপ লড়বে। আপ যে কেবল দিল্লি কেন্দ্রিক নয় তার প্রমাণ পঞ্জাব ভোটে তাদের ম্যাজিক জয়। পরামর্শদাতা সংস্থা আই প্যাক-কে নিয়ে অনেক পরিকল্পনা করেও আপের মতো কোনো ম্যাজিক দেখাতে পারেনি মমতা। ত্রিপুরাতে ভোট সংখ্যা বেড়েছে আর গোয়াতে নতুন দল হিসাবে ৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে— এই দুই স্তোক ছাড়া মমতার ঝুলিতে কিছুই নেই। মমতা খুঁজছেন ম্যাজিক। কিন্তু ফল হচ্ছে ট্র্যাজিক।

মমতার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে মোদী বিরোধী রাজনৈতিক মহলে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। গোয়া নির্বাচনের পর তা আরও জোরালো ভাবে উঠে এসেছে। গোয়ায় বিজেপির জয় আর কংগ্রেসের পরাজয়ের জন্য আড়ালে আবডালে বিরোধী নেতারা মমতাকেই দায়ী করছে। বিষয়টি ধামাচাপা দিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের পর্যালোচনা বৈঠক ডেকেছেন। ৭৫ বছর পার হলে বিজেপি কোনো নেতাকেই সরকারি বা দলীয় পদে ঠাঁই দেবে না। সবাই চাইলেও মোদী তার ব্যতিক্রম হবেন না। ২০২৪-এ মোদী ৭৪-এ পা দেবেন। মোদীর পালটা মুখ নিয়ে দলে কানাঘুঁষো চলছে। অমিত শাহ, নীতীন গড়করি বা রাজনাথ সিংহের পাশাপাশি রয়েছে 'কালো ঘোড়া' অজয় সিংহ বিস্ত বা আদিত্যনাথ যোগীর নাম। যোগীর সাফল্য ভাঙিয়ে এগোতে চাইছে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি। তাতে রাজ্যে বিজেপি বিরোধী আঁচ খানিকটা সামলানো গেলেও পুরোটা যাবে বলে মনে হয় না। সামনে অনেকগুলি রাজ্য নির্বাচন রয়েছে। সেই প্রচারে ঠিক হবে বিজেপির নতুন প্রধানমন্ত্রী মুখ কে হবেন। কেজরিওয়ালের দল এখন দু'রাজ্যে— পঞ্জাব আর দিল্লি। মমতা কেবল পশ্চিমবঙ্গে।

মমতার উভয় সংকট। ডাঙায় কেজরিওয়াল। জলে সোনিয়া। মমতার এখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা।

দিল্লিতে বিজেপিকে দুবার আটকেছেন কেজিরওয়াল। এ রাজ্যে মমতা একবার। বলতে বাধা নেই স্বচ্ছ ভাবমূর্তির দিক থেকেও মমতার চাইতে খানিকটা এগিয়ে কেজরিওয়াল। সরকারিভাবে মমতার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই। তবে রাজনৈতিকভাবে স্বজনপোষণের অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া অনেকে তাঁকে বিজেপির এজেন্ট বলেছেন। কেজরিওয়াল কিন্তু প্রায় অভিযোগ শূন্য, কেবল প্রশান্তভূষণ নিয়ে তাঁর অস্বস্তি আছে। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় কেজরিওয়ালের থেকে অনেকটাই এগিয়ে মমতা। আর সেখানেই মমতা দেখাতে পারেন 'উস্তাদের মার শেষ রাতে'। তাই মমতার উপদেষ্টা প্রশান্ত কিশোর মোদীর দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেছেন, 'সাহেব ২০২৪-র নির্বাচন দিল্লি দখলের লড়াই। রাজ্য নয়।' কিশোরের মন্তব্য রাজনৈতিকভাবে ঈঙ্গিতপূর্ণ। পরে তা আলোচনা করা যাবে। □

যোগীজী, আপনি বড্ড বোকা

মাননীয় আদিত্যনাথ যোগী
মুখ্যমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশ
যোগীজী,

আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনার দল বিজেপি একসঙ্গে চার রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে। তিন জায়গায় ফিরেছে। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, গোয়া। তবে যোগীজী আপনার রাজ্যে ফেরাটা ইতিহাস। ৩৭ বছর পরে কোনও দল পরপর দু'বার উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় এল। এ সব ব্যাপারে আমরা বাঙ্গালি অনেক এগিয়ে। আমাদের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এগিয়ে বাংলা'। কিন্তু এটা হালফিলের ব্যাপার নয়, শাসকদলকে ক্ষমতায় ফেরানোর ব্যাপারে বাংলা বরাবরই এগিয়ে। একটা সময়ে কংগ্রেস। এর পরে টানা ৩৭ বছর বামেরা। দুঃখ-কষ্ট সবই ছিল, কিন্তু তার জন্য বামেরা বাঙ্গলাকে উত্তম বাঙ্গলা বানানোর চেষ্টা করেনি। রাজ্যের মানুষেরা প্রতিবারই বলত, আর নয়। এবার উলটে দিতে হবে। কিন্তু বামেরা কে কী ভাবছে তা নিয়ে ভাবিত হতো না। বরং, কী করে বারবার ক্ষমতায় ফিরে আসতে হয়, সেটা নিশ্চিত করেছিল। রাজ্যে শিল্পায়ন কিংবা অন্যান্য উন্নয়নের চেয়ে ক্যাডার বাহিনী নির্মাণ এবং তার উন্নয়নে জোর দিয়েছিল। সে ক্যাডার বাহিনী জানত কী করে জিততে হয়। এর জন্য সরকারি উদ্যোগের দরকার পড়ত না। শেষ দিকে সেটা এমন অভ্যাসে বদলে গেল যে সিপিএম ভুলেই গেল তারা সরকারে রয়েছে। নির্বাচিত সরকার না ভেবে রাজ্যটি তাদের উত্তরাধীকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি ভাবতে শুরু করে দিল। আর তাতেই...।

এর পরে দিদি। যোগীজী, আপনি পরপর দু'বার ক্ষমতায় এলেন। দিদি পরপর তিনবার করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি আপনার মতো রাস্তা বানাতে যাননি। অযোধ্যা, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ নগরীর মতো বাঙ্গলার কোনও শহরকে সাজাতে যাননি। জিতে গিয়েছেন। আপনি বোকামো করে এত কাজ করেছেন। আর দিদিকে দেখুন। শুধু মিথ্যা বলে জিতে গেলেন। ভাঙা (পড়ুন ছদ্ম ভাঙা) পা দেখিয়ে গোটা রাজ্য ঘুরলেন। আর নিজেদের সবজান্তা বলে ভাবা বাঙ্গালি সব বুঝেও দিদিকেই ফিরিয়ে নিয়ে এল ক্ষমতায়। এর পরে দিদিকে আর দেখে কে!

দিদি তাই ঠিক করে নিয়েছেন আগামী পাঁচ বছর কোনও কাজ নয়। সিন্ডিকেট যেমন চলছে তেমনটাই চালিয়ে যাবে ভাইয়েরা। দিদি মুসলমান ভোট মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে নেবেন। আর মহিলাদের মাসে মাসে ৫০০ টাকা দিয়ে কিনে নেবেন। ভোটে জিতেই তাই তিনি বাঙ্গালি গৃহিণীদের রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছেন। লাইনে দাঁড় করিয়ে হাত পাতিয়েছেন। দিদির কাছে অঙ্ক পরিষ্কার, উন্নয়নে অনেক খাটনি। তার চেয়ে মাসে ৫০০ টাকা দিয়ে যদি একেবারে কিনে নেওয়া যায় তার চেয়ে সহজ রাস্তা আর কী হতে পারে। যোগীজী, দিদির থেকে শিখুন।

আপনার রাজ্যে সব কেন্দ্রীয় প্রকল্প কাজে লাগিয়েছেন। দিদিকে দেখুন সব কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে আত্মীকরণ করে নিয়েছেন। লোকে যে জানেন না তা নয়। কিন্তু তারা ভাবছেন, নামে কী আসে যায়! আসলে তো পাওয়া। দিদির দলেরই এক নেতা একসময় বলেছিলেন, তাঁদের পার্টিতে খালি 'খাও, খাও' চলে। সবাই সব কিছু থেকে কমিশন খেতে চায়। এটা ঠিক। বাঙ্গালি জানেও। কিন্তু বাঙ্গালি মেনে নিয়েছে। কিছু পাওয়ার জন্য কিছু খাওয়া মেনে নিতে তৈরি বাঙ্গালি। সুতরাং, আগামী পাঁচ বছর পরে দিদি ফিরবেন। আপনি ভাবছেন, দিদির অনুগত ভাই হিসেবে এটা বলছি। একেবারেই না যোগীজী। বিশ্বাস করুন। আমি জানি দিদির মাথায় আরও এমন অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। নরেন্দ্র মোদী ফ্রি রেশন পাঠাবেন। দিদি দুয়ারে রেশন পাঠিয়ে নাম কিনে নেবেন। যোগীজী, প্রচার কাকে বলে সেটা বাঙ্গলায় এসে দেখে যান। সরকারি কোষাগার থেকে আসা বিধবাভাতার টাকার নামও এ রাজ্যের স্বামী হারানো মহিলারা বলেন, 'মমতার টাকা'।

সুতরাং, যোগীজী আপনি একটা টিম পাঠান। অত বুলডোজার ঘুরিয়ে উন্নয়নের কাজ করতে হবে না। তার বদলে ভোটারদের মানসিকতায় বুলডোজার চালিয়ে দিন। বাঙ্গলায় এমন কোনও শহর পাওয়া যাবে না যেখানে রাস্তা ভালো। এমন পাড়া পাওয়া যাবে না যেখানে বর্ষায় জল জমে না। তবুও দিদির জয় সর্বত্র। রাজ্যের প্রায় সব পুরসভাই দিদির দখলে। নাগরিক পরিষেবা না দিয়েও নাগরিক সমর্থন মেলে শুধু এই রাজ্যে। তাই সব শেষে একবার ক্ষমা চেয়ে বলছি যোগীজী, শিখতে হবে না বাঙ্গলা থেকে। কারণ, বাঙ্গালি কথায় কথায় নিজেদের সবজান্তা বললেও আসলে বাঙ্গালি অনেক পিছিয়ে। মেরুদণ্ডটা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। কিংবা কোনো রাস্তার খানাখন্দে পড়ে রয়েছে। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের মানুষের নামে বাঙ্গালি অপশব্দ প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু তাদের মতো সচেতন হতে পারে না। তাই থাক। □

অতিথি কলম

স্বামীনাথন আইয়ার

অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ
জয় এনে দিল উত্তরপ্রদেশে

পাঁচ বছর আগে উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি দারুণ জয় পেয়ে ৩১২টি আসন দখল করেছিল। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে মোদীর ক্ষমতা দখলের পর এই জয়ে অনেকাংশেই তাঁর বড়ো ভূমিকার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ৩৭ বছর পর কোনো মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় বারের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রত্যাবর্তনের এই গৌরবে বড়ো ভূমিকা রয়েছে আদিত্যনাথ যোগীর। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দলের বিরোধিতার যে চালু প্রবাদ রয়েছে তাকে ব্যর্থ করে উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে দলের ভোট শতাংশ ৩৯.৭ থেকে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে ৪১.৩ শতাংশে তুলে নিয়ে যাওয়া সোজা কথা নয়। ভুললে চলবে না দু' বছর ধরে কোভিড মহামারী মোকাবিলার সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, কৃষক আন্দোলনের কারণে জনজীবনে ব্যাপক অসন্তোষ এর সঙ্গে গবাদি পশুর ফসল ক্ষেত তছনছ করার মতো নির্বাচনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলার মতো বিষয়ের অভাব ছিল না। কিন্তু নির্বাচন যে সর্বদা চোখে দেখা ইস্যু কেন্দ্রিক হয় না বহু সময়, তার মূলে থাকে জনমনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রধান পরিচালকের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি, নিষ্ঠা ও দুর্নীতির সঙ্গে আপোশহীন লড়াই চালানোর দুর্দম সাহস— এই নির্বাচন তারই প্রমাণ।

সাম্প্রদায়িকতা, মুসলমান মনে আতঙ্ক তৈরি ইত্যাদি নিয়ে যতই গলা ফাটানো হোক না কেন বিজেপি কিন্তু হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গ তুলে সেভাবে নির্বাচনকে আলোড়িত হতে মোটেই দেয়নি। বিজেপি নেতা বা কার্যকর্তা কারোর মধ্যেই বিদ্বেষপূর্ণ কোনো সরাসরি মন্তব্য আদৌ শোনা যায়নি। উলটে তারা অপরাধমূলক ঘটনা ও রাজনীতির দুর্বৃত্তকরণ নির্মূল করা, করোনার সময় মানুষের সেবা কাজ এবং বিনামূল্যের খাদ্যশস্য বিতরণের ওপর বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছিল। ৫ কিলো মাথা পিছু মাসিক রেশন কোভিডজনিত ও সামগ্রিক বেকারত্বকে অনেকটা যে লাঘব করতে পেরেছিল তার প্রমাণ ফলাফলে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, কিষান উন্নয়ন, আয়ুষ্মান ভারত প্রভৃতি প্রকল্পগুলিতে ঘুষ দেওয়া যে একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছিল তা নয়। মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে যে রাজ্য ভয়ংকর দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, চূড়ান্ত স্বজনপোষণ যেখানে রেওয়াজ এবং সরকারি দপ্তরগুলিতে অকর্মণ্যতার ঘুণ ধরে রয়েছে সেখানে যথেষ্ট সংস্কার হয়েছে। ছোটো ছোটো দুর্নীতিকে মানুষ আমল দেয়নি।

একটা উদাহরণ দিলে দেখা যাবে পুলিশের ক্ষেত্রে অতীতে শাসকদলের সমর্থকের বিরুদ্ধে অপরাধ নথিভুক্ত না করার যে রীতি চালু ছিল তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হলেও রেকর্ড অনুযায়ী পক্ষপাতহীন এফআইআর অজস্র হয়েছে। ফলে অপরাধের ঘটনাও যথেষ্ট কমেছে।

(১) ২০১৬ সালে সমাজবাদী আমলে ধর্ষণ হয়েছিল ৪৮১৬টি, ২০২০ সালে যোগী শাসনে তা নেমে এসেছে ২৭৬৯টি-তে।

(২) ২০১৪ সালে খুন হয়েছিলেন ৫১৫০ জন মানুষ, ২০২০-তে সংখ্যাটা ৩৭৭৯।

(৩) ২০১৭ সালে চুরি রাহাজানি (যোগী আসার আগে) ছিল ৬০৪৩৪। মানুষ ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল।

যোগী ২০২০-র মধ্যে তাঁর মূলত নিরপেক্ষ প্রশাসনের মাধ্যমে অপরাধীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে সংখ্যাটা প্রায় অর্ধেক করে ৩৩২৫০-এ নামিয়ে আনেন। মানুষ দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে প্রথম নিরাপত্তার স্বাদ পায়। এগুলি নিঃসন্দেহে ভোটের প্রতিফলন হয়েছে। পুলিশ মহলে আলোচনা করা সাংবাদিকের কাছে জেনেছি শোনভদ্র জেলার এক প্রবীণ পুলিশ আধিকারিকের বয়ানে 'A golden age for the police'। তিনি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী চিরাচরিত রীতিতে বারবার পুলিশের কাজে নাকগলানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ক্ষেত্রে পুলিশের নিরপেক্ষভাবে কাজ করার কারণে জনমনে একটি সুস্থ নির্ভরতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ পুলিশ আছে অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য। অতীতে দাঙ্গা যখন সংঘটিত হতো বহু সংখ্যক উভয় সম্প্রদায়ের লোক ও ধনসম্পত্তির ক্ষতি হতো। যোগী জমানায় লাভ জিহাদ বা

মেয়েদের ওপর চড়াও হওয়া আটকাতে অ্যান্টি রোমিয়ো স্কোয়াড হয়তো কিছু ক্ষেত্রে মারপিটে হাত লাগিয়েছে। কিন্তু তাতে হতাহতের সামগ্রিক সংখ্যা অতীতের একটি দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যার থেকে কম। এটি বড়ো কম কথা নয়। যোগী মানে হিন্দু, মানে দাঙ্গা— এই কপট মিথ মিথ্যে হয়েছে। জনমনে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে একটা সুরক্ষা বোধের জন্ম দিয়েছে। এমন আরও বেশ কিছু ঘটনার গভীর অভিঘাত জনমনে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে একটা সুরক্ষা বোধের জন্ম দিয়েছে। তাঁরা বিপুল সংখ্যায় যোগীর প্রত্যাবর্তনের আশায় ভোট দিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ করে নির্বাচনী রাজনীতিতে তৈরি হয়েছে নতুন ইতিহাস।

একটা কথা কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে নির্বাচনে যাওয়ার আগে বিজেপির ভোট শতাংশ প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজবাদীর থেকে প্রায় দ্বিগুণ ছিল। এক্ষেত্রে সমাজবাদী দলের কাজটা ছিল কেবল মুসলমান আর যাদব ছাড়াও যাদব নয় এমন ওবিসিদের থেকে ভোট টেনে আনা। মায়াবতীর অজাটভ সম্প্রদায়ের ভোটে ভাগ বসানোর সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা অসন্তুষ্ট বিজেপির ভোটও দখল করা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী সমাজবাদী পার্টি এক্ষেত্রে আংশিক সাফল্য পেয়েছে মাত্র। বিজেপি'র ভোটে দাঁত ফোটাতে তারা চূড়ান্ত ব্যর্থ তো হয়েছেই, উলটে পূর্ব পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিজেপি তার ভোট বাড়িয়ে নিয়েছে।

Axis my India পরিসংখ্যান অনুসারে মুসলমানদের ৮৩ শতাংশ ভোট সমাজবাদীর দিকে গিয়েছে। অন্য বিরোধীদের খুব ক্ষুদ্র কিছু অংশের ভোট তার দিকে গেছে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে মায়াবতীর নন জাটভ দলিতদের তিন চতুর্থাংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। বাকিরা সমাজবাদীকে পছন্দ করেছে। এই সমস্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের ভোট নিয়ন্ত্রিত হবে। স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এগুলি খুবই উপযোগী। যারা ভোট দিল না তাদের ক্ষোভ ও বঞ্চনার অনুসন্ধান করার কথাই তো জনহিতকর দলের কাজ। তবে ফ্রি রেশন, ফ্রি আবাসন যোজনা, ফ্রি-কিষান সম্মান, বার্ষিক ৬ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক খাতায় যাওয়ার মতো আরও বহু প্রকল্পের বেমালুম লাভ হজম করার পরও সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের মনের ক্ষোভের সন্ধান পেতে হয়তো ডুবুরি নামাতে হবে।

উত্তরপ্রদেশের প্রচারে জাঠ সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত যে কোনো দলকে সমর্থন দিয়ে মন্ত্রী হওয়া নিশ্চিত করা লোকদল নেতা প্রয়াত অজিত সিংহের ছেলে জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে জোট করেও অখিলেশ যাদব বিজেপির জাঠদের সমর্থনে সীমিত প্রভাব ফেলতে পেরেছে। কৃষক আন্দোলনের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে আলাদা অংশগ্রহণ করে নিজেদের জামানত খোয়ালেও সমাজবাদী দলের কোনো সাহায্যে আসেনি। অন্যদিকে শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করে ব্যক্তিগত উচ্চাশা পূরণ করার দুরভিসন্ধিপূর্ণ রাকেশ টিকায়েতও এই নির্বাচনে যোগ্য ঝামটা খেয়েছেন।

এতগুলি যূথবদ্ধ বিরোধিতার বিরুদ্ধে লড়াই করে ভোট বাড়াতে সক্ষম হওয়ার কারণ কোনো তৎকালীন চটজলদি বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে না। যা পাওয়া যাবে তা হলো নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে বিজেপির হিন্দু আবেগের এক অসাধারণ মেলবন্ধন যা রামমন্দির নির্মাণের লড়াই থেকে নির্মাণ পর্যায় অবধি বিস্তৃত। এর সঙ্গে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছিল অতুলনীয় কাশী করিডরের সুরম্য নির্মাণ। এগুলিই ছিল হিন্দুর আবেগ চরিতার্থতার অভ্রান্ত সংকেত।

অযোধ্যায় যে অনাদি হিন্দু অধ্যাত্মবাদের পুনরুত্থান হিন্দু মাত্রই নজর করেছেন, চলতি ভোটে বিজেপি তার সুফল পেয়েছে। বাস্তবে হিন্দুদের মধ্যে চালু থাকা ছোটো ছোটো জাতপাতের মধ্যে আবদ্ধ থাকার নীতি অযোধ্যার পুনরুত্থানে ভেঙে গেছে। জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে বৃথমুখী হয়েছে হিন্দু। ভবিষ্যৎ নির্বাচনগুলিতে এর ফল সুদূর প্রসারী হতে চলেছে।

এই নির্বাচন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে বিজেপি দ্রুত বিস্তারমান এক বৃহত্তর হিন্দু সামাজিক প্রসারণ হঠাৎ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া তাৎক্ষণিক নির্বাচনী বিস্ফোরণ নয়। এই নির্বাচনটি তথাকথিত কোনো ওয়েভ নির্ভর নয়। আদতে এটি প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও ঐতিহাসিক পরম্পরার রাজনৈতিক সাফল্যের হাত ধরে বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার এক কাঙ্ক্ষিত সংকেত। একই সঙ্গে বিজেপিকে একটি মাধ্যমমাত্র ধরে এ যাবৎ খাটো চোখে দেখা সম্ভ্রান্ত হিন্দু সংহতি ও সহিষ্ণুতার বার্তাকে সমগ্র ভারতভূমিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ও কার্যকর করার রাজনৈতিক উদ্‌ঘোষ। হ্যাঁ, বহু চর্চিত 'আইডিয়া অব ইন্ডিয়া' তৈরি করার ভার এখন যোগীজী ও মোদীজীর ওপর ন্যস্ত হলো।

(লেখক অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক এবং নিবন্ধকার)

শোকসংবাদ

হাওড়া মহানগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক সমীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৬ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। পারিবারিক আদর্শ ও নীতিকে পাথেয় করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে পথ চলা শুরু। ছাত্রজীবনেই তিনি দ্বিতীয় বর্ষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বড়োভাই স্বর্গীয় সজল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ কার্যবাহ এবং মেজভাই সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সঙ্ঘের প্রচারক। পরবর্তীকালে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যসভাপতি-সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে বহু বছর নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই ছোটো ভাই সমীরকেই সংসারের দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। চার ভাই— সজল, সুকুমার ও সুহৃদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে একমাত্র ছোটো সমীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ই বিবাহিত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি শিবপুর শিক্ষালয়ের প্রাথমিক বিভাগে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। সংসারী হয়েও তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন সঙ্ঘের কার্যকর্তা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন সেই আদর্শেরই অনুরাগী।

কংগ্রেসি-চিন্তা মুক্ত ভারত

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের সময় নরেন্দ্র মোদীর স্লোগান ছিল কংগ্রেস-মুক্ত ভারত। তারপর একের পর এক নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে আর নির্বাচনী বিশ্লেষকদের কাঠগড়ায় উঠেছিলেন তিনি। মোদী কংগ্রেস-মুক্ত ভারতের কথা বলে নাকি চরম অগণতান্ত্রিক কথা বলেছেন। গণতন্ত্রে স্বীকৃত একটা দলকে নাকি মুছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস-মুক্ত হলে নাকি ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসটাই মুছে যাবে। স্বাধীনতার পর যে দল এতগুলো বছর দেশ শাসন করলো, তাদেরকে এক নিমেষে মোছা যায় না ইত্যাদি নানা প্রকারের কথা শুনতে হচ্ছিল। পালটা যুক্তিও ছিল।

যেমন স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক মঞ্চ কংগ্রেস আর এখনকার এক নয়। বর্তমান কংগ্রেসের প্রকৃত পরিচয় হলো কংগ্রেস (ইন্দিরা) ইত্যাদি।

তবে মোদীর কংগ্রেস-মুক্ত ভারতের স্লোগানের সার্থকতা সদ্যসমাপ্ত পাঁচ রাজ্যের ভোটে পরিলক্ষিত হলো। কংগ্রেসের নির্বাচনী ভরাডুবি ভারতবর্ষের মানুষ গত সাড়ে সাত বছর দেখে দেখে এখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। সুতরাং উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মণিপুর, পঞ্জাব, গোয়ায় কংগ্রেসের ভোট বিপর্যয়ের মধ্যে নতুন কিছু নেই। বরং একে স্বাভাবিক বলেই মানুষ ধরে নিয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয়, এতদিন ধরে সুকৌশলে একটা কথা ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল যে রাহুল গান্ধীর পরিবর্তে কংগ্রেস যদি প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে তাদের মুখ হিসেবে তুলে ধরে তবে নাকি মোদীর সব জারিজুরি শেষ হয়ে যাবে। কারণ রাহুলের মধ্যে নাকি তার বাবা রাজীবের ছায়া দেখা যায় না, কিন্তু প্রিয়াঙ্কার মধ্যে তার ঠাকুমা ইন্দিরার রূপের দিব্য ছোঁয়া।

তাই এবার উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে দলের তরফে প্রধান মুখ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের নির্বাচনী বিপর্যয় এড়ানো যায়নি। এমনকী নেহেরু গান্ধী পরিবারের শক্ত ঘাঁটি, রাহুল গান্ধী-সোনিয়া গান্ধীর নির্বাচনী ক্ষেত্র, ইন্দিরাও যেখান থেকে বহুবার জিতেছেন, সেই রায়বেরিলি-আমেঠিতে কংগ্রেস একটা আসনও জিততে পারেনি।

ভারতীয় রাজনীতিতে অটলবিহারী বাজপেয়ী বহুদলীয় সরকারি ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন ১৯৯৮-তে তেরো শরিক দলের সরকার গঠন করে। তখনো আমরা দেখেছি কংগ্রেসের একটা নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক ছিল। যাঁরা যে কোনো পরিস্থিতিতেই কংগ্রেসকেই শুধুমাত্র ভোট দেবে। নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে আমরা দেখলাম, কংগ্রেসের সেই নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক অবলুপ্ত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের তথাকথিত একমাত্র রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে এবং 'রাজপরিবার' হয়ে ওঠার যে সুযোগ কংগ্রেস নিচ্ছিল, তাও যেন নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

এখানেই বলার কথা, নরেন্দ্র মোদী ডাক দিয়েছিলেন, কংগ্রেসি চিন্তা মুক্ত ভারতের। এবং আজ স্বীকার করতেই হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই আহ্বানের যথার্থতা উপলব্ধি করেছেন দেশবাসী।

শুধু যে দেশে কংগ্রেসের পরিস্থিতি বেহাল কিংবা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কংগ্রেসের আসন শূন্যে নেমে গিয়েছে বা সর্বশেষ পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে তাদের ক্রমাগত ব্যর্থতা, এটা কংগ্রেস (আই)-এর ব্যর্থতা কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রকে যা এতদিন কলুষিত করেছে অর্থাৎ পরিবারতন্ত্র, স্বৈরাচার (যার নজির ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থার সময় দেশবাসী দেখেছে), কায়েমি স্বার্থ ইত্যাদি, যে বিষয়গুলো একান্তভাবেই ভারতীয় গণতন্ত্রে কংগ্রেসের অবদান, এর থেকেই মুক্ত হওয়ার কথা বলেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। আগেই যদিও আভাস পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু এই সদ্য সমাপ্ত পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফল, বিশেষ করে রাহুলের পর প্রিয়াঙ্কাকেও মানুষ যেভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন, তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নেহরু-গান্ধী পরিবারের নাগপাশ থেকে ভারতবাসী সত্যিই মুক্তি পেতে চাইছেন।

> **দেশভাগ থেকে শুরু করে স্বাধীনোত্তর ভারতে অধিকাংশ সময় দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সুবাদে ভারতীয় গণতন্ত্রে যে কালিমা লেপন হয়েছিল তার থেকে মুক্তির আলোকরেখাটুকু অন্তত দৃশ্যমান হচ্ছে।**

কংগ্রেসের এই অবস্থা বিপর্যয়ে সবচেয়ে গাড্ডায় পড়বে কারা? স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বলে, কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সমর্থক ও ভক্ত যাঁরা। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির পাটিগণিত অত সরল রৈখিক নিয়মে চলে না। কংগ্রেসের বিপর্যয়ের দুশ্চিন্তার ভাঁজ যাদের কপালে তারা হলো কমিউনিস্ট। কারণ নেহরুকে সামনে রেখে ভারতকে দুর্বল করার যাবতীয় চক্রান্ত তাদের। এ ব্যাপারে বহু আলোচনা হয়েছে এই স্বস্তিকারই পাতায়। তাই আর চর্বিতচর্বণ করা হলো না। শেষে শুধু এটুকুই বলার, দেশভাগ থেকে শুরু করে স্বাধীনোত্তর ভারতে অধিকাংশ সময় দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সুবাদে ভারতীয় গণতন্ত্রে যে কালিমা লেপন হয়েছিল তার থেকে মুক্তির আলোকরেখাটুকু অন্তত দৃশ্যমান হচ্ছে।

তবে এতে আত্মতুষ্টির বিশেষ কোনো কারণ নেই। কারণ নানা কিসিমের কমিউনিস্টরা রাহুল, প্রিয়াঙ্কা, সোনিয়াকে অক্সিজেন দিতে তৈরি। এতে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের কেমন জাল বোনা হতে পারে তা ২০১৬-র জেএনইউ কাণ্ডের সময়ই দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছেন। এব্যাপারে দেশের স্বার্থেই দেশবাসীকে সতর্ক হতে হবে।

আচার্য চাণক্য কুটিল নীতির নয়, রাষ্ট্র নির্মাণের স্রষ্টা

কাশ্যপ সেনগুপ্ত

সাম্প্রতিককালে সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে 'চাণক্য' নামটা খুবই ট্রেন্ড হচ্ছে। সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত, ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপে যে পারছেন সেই বিশেষজ্ঞের মতো চাণক্য 'এই বলেছেন, ওই বলেছেন' বলে অনেক ভারী ভারী জ্ঞানের কথা শুনিয়ে দিচ্ছেন। যদিও তাদের মধ্যে কতজন যে 'বিশেষজ্ঞ' এবং চাণক্য সম্পর্কে কতটা কী জানেন, সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইউটিউবে তো হাজারো ভিডিয়োর ছড়াছড়ি। যার মধ্যে প্রকৃত বিশেষজ্ঞের তথ্য ও বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ ভিডিয়োর সংখ্যা খুবই কম। আর সবার ওপর দিয়ে এক কদম এগিয়ে গেছেন গুটি কয়েক সংবাদপত্রের জনাকয়েক সর্বজ্ঞ সাংবাদিক। তাঁরা ভারতের প্রায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দলেরই এক বা দু'জন করে ব্যক্তিকে সেই দলের অথবা সেই দল যে পন্থার (দক্ষিণ/মধ্য/বাম) রাজনীতি করে, তার 'চাণক্য' বলে দেগে দিচ্ছেন। তা এতোই যখন চাণক্যের ছড়াছড়ি বর্তমান ভারতে তাহলে আমাদের এই দেশটার এতো দুর্দশা হয় কী করে? ইতিহাস বলে, পৃথিবীতে চাণক্য একজনই ছিলেন, সেই মহামতির জন্মভূমি থেকে কর্মভূমি সবই ছিল এই ভারতবর্ষ। তবে আজকের ভারতবর্ষ নয়, প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশ। যেখানে আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ সবই ছিল এক অখণ্ড বিশাল ভারত ভূখণ্ডের অঙ্গ।

সোশ্যাল মিডিয়াতে অঢেল সময় ব্যয় করে যাঁরা চাণক্যের নামে বড়ো বড়ো বুলি কপচাচ্ছেন, তাঁদের কিছু বলার নেই। বাক্য ও মতামত প্রকাশের অধিকার সকলের আছে, ফলত যা খুশি বলার ওপরে একটা অধিকার জন্মে গেছে। এর জন্য কোনও কর লাগে না। এদের মধ্যে আবার ছোটো-বড়ো একাধিক রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন মাপের নেতারাও আছেন। তাঁরা আজকের চাণক্য হওয়ার দৌড়ে নেমে পড়েছেন। 'সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ'— এই চতুর্বিধ নীতিকে ব্যবহার করেন জনতার চোখে ধুলো দিয়ে নিজেদের আখের গোছানোর কাজে। বিরোধীদের কুপোকাত করার কাজে। সে বিষয়ে তারা সিদ্ধহস্ত। কিন্তু মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব বা দায়বদ্ধ থাকার প্রশ্নে অথবা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, অখণ্ডতা ও সীমানাকে সর্বাগ্রে কেমন করে সুরক্ষিত রাখতে হবে, সেই বিষয়টা তাদের কাছে অনেক পেছনের সারিতে। রাষ্ট্র না থাকলে যে সাধারণ মানুষ থেকে দলের নেতা, কারোরই কোনও স্বার্থ পূরণ হবে না, সেটা ক'জন মাথায় রাখেন? কিন্তু খ্রিস্টের জন্মের ৩৭০ বছর আগে রাষ্ট্রতত্ত্বের যে স্রষ্টা এই ভারতে জন্মেছিলেন, তিনি এই চতুর্বিধ নীতিকে সম্পূর্ণ ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন জনকল্যাণ, জনতার সামগ্রিক বিকাশ ও উন্নতি, রাষ্ট্রের কৃষি-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি, প্রশাসন ও রাজনীতির শুদ্ধিকরণ এবং অখণ্ড ভারতরাষ্ট্রের নির্মাণ ও তার সুরক্ষার কাজে। যেখানে শাসক রাজা সর্বোচ্চ কর্তব্যের অধিকারী হলেও শেষ পর্যন্ত প্রজার প্রকৃত সেবক হতে বাধ্য। আজকের ভোট প্রার্থী নয়। নাগরিকের কাছে চূড়ান্ত ভাবে দায়বদ্ধ। আজকের দিনে তা দলীয় স্বার্থ ও দলের সুপ্রিমোর কাছে। শাসকের ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই, নিহিত ক্ষেত্রে স্বার্থ বলে কিছু থাকতে পারে না। রাজধর্মের অনুশাসন তাঁকে পালন করতেই হবে, কারণ জনগণের হিত ও সুখেই শাসকের হিত ও সুখ। শাসক যদি সেই রাজধর্ম পালনে ব্যর্থ হন, নিজের আখের গোছাতে থাকেন, তাহলে তাঁর কোনও অধিকার নেই সিংহাসনে বসে থাকার। আজকের দিনে ভারতীয় রাজনীতির কারবারিদের ক্ষেত্রে তা কার্যত 'ডুমুরের ফুল'।

একদা পশ্চিমবঙ্গে অনিল বিশ্বাসকে বলা হতো সিপিআইএমের চাণক্য। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পামুলাপার্তি বেঙ্কট নরসিমহা রাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁকেও সম্বোধন করতে শুনেছিলাম চাণক্য হিসেবে। শেষে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে তাঁকেও বলা হলো চাণক্য। কিন্তু নিখাদ সত্য হলো— এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের কর্মকর্তব্যের সর্বোচ্চ স্থানে গেছেন, নিজেদের চূড়ান্ত যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতাকে প্রমাণ করেছেন। অনেকেই চাণক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন কিন্তু এঁরা কেউই চাণক্য নন। যাঁরা এঁদেরকে চাণক্য হিসেবে সম্বোধন করেছেন বা চাণক্যের সঙ্গে তুলনা করছেন, তাঁরা কার্যত চাণক্যকে যেমন অপমান করছেন, তেমনি একই সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠিত মানুষদেরকেও অপমান করছেন। কারণ এঁদের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও দলীয় রাজনীতির অভ্যন্তরীণ যে বিস্তৃত পার্থক্য আছে, তাকে উপেক্ষা করে যাওয়া কার্যত অসম্ভব ছিল। যদিও তাঁরা জানতেন উভয়ের 'অন্তর'কে। কিন্তু মহামতি চাণক্য এসবের অনেক ঊর্ধ্বে। কারণ ২৩৬০ বছর আগে চাণক্য রাজনৈতিক ও রাজনীতির প্রভেদ কী এবং কখন উভয়ে একে-অপরের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে বা পড়তে পারে, সেই ধারণার অভিজ্ঞতালব্ধ তাত্ত্বিক জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন অখণ্ড ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষিতে। সুতরাং তাঁর সঙ্গে এঁদের তুলনা যারা করেন, তাদের পাণ্ডিত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত।

ভারতের নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শনের যোগ্য কাণ্ডারি শুধু নয়, মহামতি চাণক্য হলেন 'Philosopher of the state craft'। তিনি তাঁর অর্থশাস্ত্রের রাষ্ট্রের জনসমাজ সম্পর্কিত হেন বিষয় নেই, যাকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। R.A. Kangle তাঁর The Kautilya Arthasastra গ্রন্থে লিখেছেন, 'Arthasastra is the science which is the means of the acquisition and protection of the earth'। পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশীলার ছাত্র তথা সেখানকারই আচার্য রূপে চাণক্য বিশ্বের তৎকালীন সভ্যতাগুলোর সামনে উপস্থিত করেছিলেন অপার শক্তিশালী মৌর্য সাম্রাজ্যকে, চন্দ্রগুপ্তের মতো শাসককে তৈরি করেছিলেন সমাজের প্রান্তিক স্তর থেকে। ভারত কয়েক সহস্রাব্দ ধরে বহিঃশত্রুর আক্রমণের শিকার। শত্রুর আক্রমণের সামনে সুদৃঢ় ভাবে টিকে থাকতে গেলে অভ্যন্তরীণ রাজ্যগুলোর দ্বিধাদ্বন্দ্বকে ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠন করা ছাড়া আর কোনও উপায় যে নেই, তা তিনি দেখিয়েছেন প্রথম। রাজনীতির শুদ্ধিকরণের জন্য নিজের সমগ্র জীবন দান করেছেন। তাঁর রাজনীতি ধর্মের প্রধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, যে 'ধর্ম' পশ্চিমের সম্প্রদায় ভিত্তিক রিলিজিয়ন নয়,

ফঃ ২

সম্পূর্ণ রূপে ভারতীয়। যেখানে ন্যায়, নীতি, কর্তব্য, উত্তর-দায়িত্ব হলো মুখ্য। রিলিজিয়নের ভারতীয় সমার্থক শব্দ রূপে 'ধর্ম'কে ইংরেজরা চিহ্নিত করেছেন। চাণক্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাহিত্যে প্রথম একটি কেন্দ্রীভূত ও শক্তিশালী সরকারের পরিচয় প্রকাশ করেন। অর্থশাস্ত্রেই প্রথম রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। তিনিই প্রথম রাষ্ট্রের ও বৃহত্তর সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজা (শাসকের অপরিহার্য গুণাগুণ ও যোগ্যতা, সর্বোচ্চ ভূমিকা), মন্ত্রী ও আমলাতন্ত্রের, জনপদের গুরুত্ব, রাজকোষ, বিচারব্যবস্থা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রের নিজস্ব অতি দক্ষ-শিক্ষিত গুপ্তচর বাহিনী থাকা কেন প্রয়োজন, তা কবেই নথিভুক্ত করেছেন। আইনের অনুশাসন, জনকল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিরিখে শাসনব্যবস্থার মানকে বিচার করার সূত্র দিয়েছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা জানিয়েছে, ম্যাকিয়াভেলি (১৫১৬) হলেন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক। চাণক্য হলেন ভারতের ম্যাকিয়াভেলি। কিন্তু দুজনের মধ্যে প্রায় ১৯০০ বছরের তফাত। ভারতীয় বহু গ্রন্থের প্রতিলিপি বিদেশিদের মাধ্যমে আরব দুনিয়া ও ইউরোপে ছড়িয়েছে। আবার আক্রমণকারীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অজস্র পাণ্ডুলিপি অনেক কিছু জ্বালিয়েছে। অতীতের প্রভাব ভবিষ্যতের ওপরে পড়তে পারে, কিন্তু অতীতকে ভবিষ্যতের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। চাণক্য কখনোই ম্যাকিয়াভেলি হতে পারেন না, কারণ চাণক্য অ্যারিস্টটলের সমসাময়িক। জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রেও জেনেছি উড্রো উইলসন হলেন জনক। কিন্তু ২৩০০ বছর আগে ভারতে যে বিশাল জনপ্রশাসন ব্যবস্থা বিস্তার করেছিল তাতে চাণক্যের কী ভূমিকা ছিল তার প্রমাণ প্রমথনাথ ব্যানার্জির Public Administation in Ancient India, K.K. Mishra-র Police Administation in Ancient India-সহ আরও অজস্র গ্রন্থ। রাষ্ট্রের যে স্বতন্ত্র পররাষ্ট্র নীতি ও তাকে পরিচালনা করার জন্য দক্ষ কূটনীতির প্রয়োজন, তা প্রথম চাণক্য রচনা করেন, যখন আজকের ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও অস্তিত্বই ছিল না।

সংসদীয় ব্যবস্থায় দুজন শাসক সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হলেন – রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। বাস্তবে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মেনেই কাজ করেন। প্রণব মুখোপাধ্যায়কে রাষ্ট্রপতির সর্বোচ্চ পদে তাঁর দল কংগ্রেস বসিয়েছিল, তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে। যদিও প্রণব মুখোপাধ্যায় নিজে কয়েকবার (প্রধানত ২০০৪-২০১৪) প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে থেকে সিংহাসনে বসতে গিয়েও শেষ অব্দি বসতে পারেননি। কেন, সবাই জানেন, রাহুল গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের পথে যেন কোনও বাধা না আসে। অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশ সামন্তের বাংলা কংগ্রেস থেকে যাত্রা শুরু করে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের হাত ধরে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কংগ্রেসের রাজনীতিতে আসা। পরবর্তী সময়ে নিজের জ্ঞান, তুখোড় উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা, বাগ্মিতা, রাজনীতির অনুশীলন ও ধৈর্যের সাহায্যে ১৯৮০-র দশকে ইন্দিরা গান্ধীর অন্যতম পরামর্শদাতা ও অর্থদপ্তর-সহ পরবর্তী সময়ে ভারতের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রের মতো একাধিক দপ্তরের মন্ত্রী হয়ে ভারতের উন্নয়ন ও রাষ্ট্রনির্মাণের কাজে অবদান রেখেছেন। কিন্তু দলীয় হাইকমান্ডের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার জেরে কংগ্রেস ছেড়ে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল রাজীব গান্ধীর অমলে। আবার বাস্তববাদী ছিলেন বলেই, সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। দলীয় ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজের প্রভাব ফেললেও রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে পর্যন্ত, নিজের দর্শন ও পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে যেতে পারেননি। এমনকী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সভাতে যাবেন কেন বা গিয়ে কী বলবেন, সে নিয়েও তাঁর দল থেকেই অনেক আতঙ্কমাখা শ্লেষ উঠতে দেখা যায়।

নরসিমহা রাও ভারতের একমাত্র সংখ্যালঘু সরকারের মুখিয়া ছিলেন, যে সরকার পুরো পাঁচ বছর শুধু ক্ষমতায় ছিল তাই নয়, পণ্ডিত নেহরুর আমল থেকে চলে আসা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোকেই মূল সমেত উৎপাটিত করেন। দু'হাত বাড়িয়ে উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ, বিশ্বায়নের ত্রিশক্তিকে ভারতে স্বাগত জানায়, দেউলিয়া হতে চলা ভারতীয় অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্য। নতুন ভারতের নতুন অর্থনীতির জনক তিনি। কারণ প্রধানমন্ত্রী যদি বাস্তব প্রয়োজনকে চিনতে না পারেন, তাহলে কোনও মন্ত্রী একক ভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ করতে পারেন না। গোপনীয়তাকে ত্যাগ করে প্রকাশ্যে ইজরায়েলে প্রথম ভারতীয় দূতাবাস গড়ে তোলেন, প্রথম পূর্ব-এশিয়ার দিকে সামগ্রিক ভাবে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এগিয়ে যান। সমাজতন্ত্রের পতনকে আঁচ করে আমেরিকার সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক গঠনে উদ্যোগী হন। এসবের পরেও তিনি সম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতির অভিযোগ বিদ্ধ হয়েছেন। সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেসের ব্যাটন হাতে নেওয়ার পর তাঁর গতি কী হলো, সবাই দেখেছেন। আসলে তিনিও দলীয় সীমারেখার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেননি, চেষ্টা করার ফল হাতেনাতে পেয়েছিলেন।

অনিল বিশ্বাস তো কখনো চাণক্য হতেই পারেন না। তিনি যে আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, সেখানে রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। রাষ্ট্রকে শ্রেণী শোষণের যন্ত্র রূপে দেখা হয়। রাষ্ট্রের ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েম হবে আশা করা হয়। আমলাতন্ত্রকে মার্কস প্যারাসাইটিক নেচার অব জার্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিপ্লব বা বন্দুকের নল দিয়ে লেনিন বা মাও যে সমাজতন্ত্র কায়েম করেছিলেন তা মহামতি চাণক্যের শাসনতন্ত্র ও জনকল্যাণের সম্পূর্ণ বিপরীত। কমিউনিজমের কাছে সবার ওপরে দল কিন্তু কৌটিল্যের কাছে রাষ্ট্রের সামগ্রিকতা। সমাজের সর্বস্তরে (বিশেষত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে) দলীয় নিয়ন্ত্রণ ও আনুগত্য কায়েমের ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত হলেও তাঁর সেই কুটিল কৌশল কৌটিল্য শব্দের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

স্বাধীনতার পর পণ্ডিত নেহরু ভারতের বিদেশনীতি, অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা নীতি নির্মাণে মার্কসীয় নির্ভরতা তত্ত্বের উদগাতা অন্দরে গুন্ডাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল নাস্তি। বিচ্ছিন্নতা ছিল মৌলিক উপাদান। ফলত, উপস্থিত বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে অলীক ভাবাদর্শবাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফল কী হয়, জোটনিরপেক্ষতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক নেহরু চীন আক্রমণের সময়ে নির্বান্ধব থেকে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরিরা বাস্তববাদী হতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত আদর্শবাদী থেকে গেছেন। না হলে, ১৯৯৮-এর ১১ মে পোখরানে পরমাণু শক্তির পরীক্ষা হয় ১৯৭৪-এর পর? নরসিমহা রাও থেকে প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকেই এই পথের পথিক। বিগত সাত দশকেও ভারতের নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষা নীতি তৈরি হলো না? ভারত স্বাধীনতার পর আচার্য চাণক্যকে অনুসরণ করেনি, কারণ নীতি নির্মাতাদের মাথায় ছিল সেই মেকলেবাদী কৌশলী শিক্ষা— 'ভারতের নিজস্ব সৃষ্টি বলে কিছু ছিল না, সবই সাহেবদের দান'। অন্যদিকে, মাও-য়ের নেতৃত্বে চীন তার দেশের কৌটিল্য অর্থাৎ 'হান ফেইজী (২৮০-২৩৩ খ্রি.পূ.)-র রাজনৈতিক দর্শন প্রথম দিন থেকে অনুসরণ করছে। চাণক্যের দর্শন সর্বাগ্রে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার কথা বলে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনীতি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপরে প্রশ্ন তুলে দেয়। চাণক্য নীতি ১৩০০ বছর পরেও কতটা প্রাসঙ্গিক ও সমসাময়িক, তার প্রমাণ বর্তমান সরকারের চাণক্য রচিত বিজিগীষু রাজার দ্বাদশ রাজমণ্ডলের doctrine-কে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। যারা চাণক্যের দর্শন জানেন, তারাই বুঝতে পারবেন দ্বাদশ রাজমণ্ডলের সাফল্য আজকের দিনে কত প্রাসঙ্গিক। ▯

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় গোঁড়ামি দেশের সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক

দেশের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধ করে শিক্ষাপ্রাঙ্গণকে তালিবানীকরণ থেকে রক্ষা করা হোক, অন্যথায় ক্রমশ পুলিশ, আর্মি, নার্সিংয়ের পেশায় কর্মরত মহিলাদের পক্ষ থেকে হিজাবি পরিধানের দাবি উঠবে।

রঞ্জন কুমার দে

কর্ণাটকের হিজাব বিতর্ক দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় আলোচনার নতুন ইস্যু তৈরি করেছে। ঘটনার সূত্রপাত হয় যখন রাজ্যটির এক কলেজে বিশেষ কোনো ধর্মীয় পোশাক না পরে কলেজের নির্দিষ্ট পোশাক পরে আসতে কয়েকজন মুসলমান ছাত্রীকে বাধ্য করা হয়। তারপর বিষয়টি রাজপথ থেকে হাইকোর্টের দরজা পর্যন্ত গড়ায়। বিতর্ক ঠাণ্ডা করতে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কয়েকদিনের জন্য বন্ধও করে দেয় রাজ্য প্রশাসন। এমনিতেই কর্ণাটক বিজেপি শাসিত রাজ্য, ফলে হিজাব বিতর্ক চরম মাত্রা পেয়ে যায় যখন রাজ্যের আরেকটি কলেজে হিজাব পরিহিতা কোনো ছাত্রীকে লক্ষ্য করে কিছু ছাত্র 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে শিক্ষা প্রাঙ্গণ মুখর করে তোলে। কর্ণাটকে সংবিধানকে যথেষ্ট সম্মান জানিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এতদিন স্কুল-প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ড্রেস কোড মেনে আসছিল, হঠাৎ ধর্মীয় পোশাক ও বিদ্রোহে দেশে ধারাবাহিক অস্থিরতার পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের আঁচ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সুনির্দিষ্ট প্রোপাগান্ডা বাস্তবায়নে ছাত্র সমাজ ও সাধারণ মানুষকে মিথ্যা কথা বলে উসকে দিয়ে সমাজে ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে। আমরা বিগত দিনে দেখেছি প্রধানমন্ত্রীর একটা ভাষণকে বিকৃত করে তিনি ১৫ লক্ষ টাকা অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে প্রচার করে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করা হয়েছিল, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট-এর উদ্দেশ্যকে বিকৃতভাবে প্রচার করে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার মিথ্যা বিষবাষ্প প্রচার করা হয়েছিল। কেন্দ্রের কৃষি সংশোধনী বিলে প্রধানমন্ত্রী শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন ভুয়ো প্রচারে বিলের উপকারিতা সাধারণ কৃষকদের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। একই অবস্থা হয়েছিল ইভিএম কিংবা দুর্নীতির ইস্যুতেও। হিজাব বিতর্কও একই উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ এটিও আন্তর্জাতিক স্তরে দেশকে মলিন করার অভিপ্রায় মাত্র। হিজাব বিতর্ক কর্ণাটক রাজ্যে প্রথম এমন নয়, কিংবা শুধু ভারতে হচ্ছে এরকমও নয়। পৃথিবীর প্রায় ডজনখানেক দেশে হিজাব বা বোরখায় বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে কর্ণাটকের উদুপীর কলেজের মতো কেরলে গুটিকয়েক মুসলমান ছাত্রী স্কুল কর্তৃপক্ষের ড্রেসকোডকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কেরল হাইকোর্টে ধর্মীয় স্বাধীনতার জিগির তুলে ইউনিফর্মের বদলে হিজাব ও ফুলহাতা শার্ট পরার দাবি জানায়। হাইকোর্ট-বেঞ্চ আবেদনকারীদের তীব্র ভর্ৎসনা করে রায়দান করেছিল যে, ধর্মীয় পোশাক কখনো স্কুল ইউনিফর্মের বিকল্প হতে পারে না।

ভারতীয় সংবিধানের ২৫-এর ১ নং ধারায় ধর্মীয় ড্রেস কোডের ক্ষেত্রে একজনের নিজস্ব ধারণা ও বিশ্বাস অনুসরণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। সমান্তরালভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানেরও নিজস্ব কিছু অধিকার রয়েছে। তখন নিশ্চয়ই আদালতকে প্রতিযোগী মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে ভারসাম্য রেখে সমস্যার সমাধান সূত্র খুঁজে বের করতে হয়। কোর্ট আরও জানায় যে নিজেদের পছন্দমতো পোশাক নির্বাচন করা আবেদনকারীদের মৌলিক অধিকার বলে বিবেচনা করতে কোনো বাধা নেই, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কোনো অনুষ্ঠান-বাড়ি নয় যে ছাত্র-ছাত্রীরা যে যা খুশি পোশাক পরে আসতে পারে। কেরল হাইকোর্ট তাঁদের

রায়দানে আরও জানায় যে প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর অধিকারের বিপরীতে আবেদনকারীরা তাদের ব্যক্তিগত অধিকার আরোপ করতে পারে না। হিজাব কিংবা ফুলহাতা শার্টে ছাত্রীদের প্রবেশাধিকার একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষই দিতে পারে সেখানে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাদের আবেদন খারিজ করে জানিয়ে দেওয়া হয়, ছাত্রীরা যদি স্কুলটি ছাড়তে চায় তাদের যেন স্কুলের তরফ থেকে স্থানান্তর শংসাপত্র দিয়ে দেওয়া হয়।

ফ্রান্সে ১৯৮০-র শেষে হিজাব বিতর্ক খুব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ফ্রান্সে গির্জা ও প্রশাসনকে পৃথক রাখার আইন ফরাসি ভাষায় 'লে-ল্যসিটে নামে পরিচিত। যেটি সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। তাদের সাংবিধানিক নীতিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপরে আইনের মান্যতাকে রাখা হয়েছে। ক্রমশ ফ্রান্সের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ মহল অনুভব করেন যে স্কুলে মেয়েদের হিজাব পরা ফ্রান্সের সাংবিধানিক রীতির পরিপন্থী। তাই ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত তৎকালীন ফরাসি সরকারের একটি কমিশন স্কুলে ধর্ম পরিচয় বহনকারী হিজাব, ইহুদিদের টুপি এবং খ্রিস্টানদের ক্রুশচিহ্ন পরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে সুপারিশ জানায়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কোনোরকম আপত্তি না জানালেও ইসলাম অনুসারীরা ইসলামোফোবিয়ার সুর তোলেন এবং সারা ফ্রান্সের রাজপথ জুড়ে বিশাল হিজাব আন্দোলন গড়ে তোলেন, নাম দেওয়া হয়েছিল 'সি-ই-পি-টি', যেটার পুরো অর্থ ছিল, 'সবার জন্য শিক্ষা'।

মোল্লাবাদী সকল গতিবিধির প্রতিরোধ গড়ে তুলে ২০০৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ফরাসি এমপিদের সংখাগরিষ্ঠ সমর্থনে বোরখা বা হিজাবে প্রতিবন্ধকতা লেগে যায়। হিজাব বা বোরখার আড়ালে দুষ্কৃতকারীদের উৎপাত রুখতে পশ্চিমী দেশগুলো এই পোশাকের উপর বিভিন্নরকম প্রতিবন্ধকতা, জরিমানা ও সশ্রম কারাদণ্ড ধার্য করতে বাধ্য হয়। এই দেশগুলোর মধ্যে বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, ইতালি, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, স্পেন, ব্রিটেন, আফ্রিকা, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, বুলগেরিয়া অন্যতম। শ্রীলঙ্কায় ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে বোরখা পরিহিত আত্মঘাতী বোমারু জঙ্গিরা সেখানকার ক্যাথলিকদের উপাসনাস্থল এবং পর্যটকদের হোটেলে হামলা চালালে ২৭০ জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়।

জরুরি অবস্থায় সরকার সব ধরনের মুখঢাকা পোশাকে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও ২০২১ সালে শ্রীলঙ্কার সরকার বোরখাকে ধর্মীয় উগ্রবাদের পোশাক আখ্যা দিয়ে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার জন্য আইনি পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। তুর্কির সংস্থাপক মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক হিজাবকে আদিমযুগের পোশাক আখ্যা দিয়ে আংশিক নিষিদ্ধ করে রাখেন। কিন্তু ৮৫ বছরের দীর্ঘ ধর্মনিরপেক্ষ দেশটি ক্রমশ কট্টর মোল্লাবাদীদের চাপে সংবিধান একাধিকবার সংশোধিত হয়ে আজ সেখানে পুলিশ বাহিনীতেও হিজাবের অনুমোদন রয়েছে। গত বছরের আগস্ট মাসের ২১ তারিখে এলাহাবাদ হাইকোর্ট পুলিশ কনস্টেবল মহাম্মদ ফরমানের দায়ের করা একটি মামলায় রায়দান করে যে সংবিধানের ২৫নং ধারা ধর্মীয় পরিচয়, ধর্মীয় পেশা, ধর্মীয় স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে। কিন্তু কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী কিংবা অনুশাসিত বাহিনীর পেশায় দাড়ি রাখার অনুমতি দেয় না। কিছুদিন আগে দেখা গিয়েছে, ওয়াকফ বোর্ডের নিজস্ব জমি থাকা সত্ত্বেও হরিয়ানার গুরুগ্রামে একাধিক জায়গায় সর্বজনীন স্থানে কিংবা পার্কে নামাজ পড়ার নাছোড়বান্দা জিদ, দেশজুড়ে খুব সমালোচিত হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে ইসলমিক দেশ আরব আমিরশাহিতে মসজিদ ছাড়া এরকম সর্বজনীন স্থানে নামাজ পড়লে Regulations of Law No. 178 আইন অনুযায়ী ভারতীয় মুদ্রায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়। মহারাষ্ট্রে কট্টর ইসলামিক মোল্লাবাদীরা পাকিস্তানের ব্ল্যাসফেমি আইনের সমান্তরালে 'Prophet Muhammad and Other Religious Heads Prohibition of Slander Act, 2021' or Hate Spech (Prevention) Act, 2021'-এর খসড়া বানিয়ে বিধানসভায় পাশ করাতে চায়। দেশের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতি লক্ষ্য রেখে গত ১৯ ডিসেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্ট কেন্দ্র সরকারকে অবিলম্বে ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করতে নির্দেশ দেয়। আদালত সংবিধানের ৪৪নং ধারা উল্লেখ করে বলে যে, 'state shall endeavour to secure for the citizens a Uniform Civil Code (UCC) throughout the territory of India'।

কর্ণাটকের শিক্ষা আইন ১৯৮৩-র ধারা ২-তে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলক পোশাকবিধি নির্ধারণ করার অনুমতি দেয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় সংবিধানকে বার বার চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছে। দেশজুড়ে পুরো সিস্টেমকে ইসলামোফোবিয়ায় ঢেকে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। কংগ্রেস পরিবারের এক নেত্রী বলছেন ছাত্রীরা চাইলে বিকিনি পরেও শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে পারে। হিজাব আন্দোলনকারীদের দেওয়া হচ্ছে আইফোন কিংবা ৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার। এরাই আবার ২০০৮ সালে আহমেদাবাদ সিরিয়াল বম্বিংয়ের ঘটনায় ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের আইনি সাহায্য দিয়ে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করছে। অনতিবিলম্বে দেশের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধ করে শিক্ষাপ্রাঙ্গণকে তালিবানীকরণ থেকে রক্ষা করা হোক, অন্যথায় ক্রমশ পুলিশ, আর্মি, নার্সিংয়ের পেশায় কর্মরত মহিলাদের পক্ষ থেকে হিজাবি পরিধানের দাবি উঠবে এবং কেউ এর প্রতিবাদ জানালে কর্ণাটকের যুবক হর্ষের মতো অকালে প্রাণ দিয়ে চরম মূল্য চোকাতে হবে। □

ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম !

এই বিভ্রান্তি দূর হওয়া প্রয়োজন

হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত ঈশ্বরকে কোনোভাবেই সেমেটিক গ্রন্থসমূহে প্রতিপাদিত ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

ড. রাকেশ দাশ

অহিন্দু মতাদর্শগুলি বহুকাল যাবৎ হিন্দু সমাজের সাংস্কৃতিক একাত্মতাকে নষ্ট করার অপচেষ্টা করে চলেছে। এই অপচেষ্টার ফলস্বরূপ হিন্দু সমাজের মধ্যে বহু যুক্তিহীন, হাস্যকর এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক বিচারধারা ব্যাপ্ত হয়েছে। বিশেষত, আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে বহু ভ্রান্ত ধারণা সমাজে প্রচারিত হয়েছে। এই ভ্রান্ত ধারণাগুলি আধ্যাত্মিকতার নামে সমাজের প্রাণভোমরা স্বরূপ সংস্কৃতিকে কলুষিত করছে এবং সামাজিক একাত্মতাকে ধ্বংস করছে।

প্রাচীন হিন্দু সমাজে সামাজিক নিয়ম ও নীতি অত্যন্ত সুচিন্তিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মানুষ সামাজিক নিয়মগুলি অত্যন্ত কঠোর ভাবে পালন করতেন। এমনকী যারা নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন তারাও সামাজিক নিয়ম উলঙ্ঘনের প্রয়াস করলে তাকে দণ্ড দেওয়া হতো বা নির্বাসিত করা হতো। কোনো সামাজিক নিয়মের পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হলে বিশেষজ্ঞ ঋষিদের ডাক পড়ত। তাঁরা যথাযথ বিচার বিশ্লেষণের পরে প্রয়োজনীয় নিদান দিতেন। সামাজিক রীতির এই কঠোরতম কারণেই দীর্ঘকাল ধরে বৈদেশিক আক্রমণের পরেও হিন্দু সমাজ থেকে হিন্দুত্বের ভাবনা পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। অপরপক্ষে দেখা যায় যে, সমগ্র আফ্রিকা সমেত মধ্যপ্রাচ্যে প্রাচীন সম্প্রদায় ও তাদের সংস্কৃতি পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন সংস্কৃতির অবশেষ স্বরূপ পারস্য জাতি এখনও পর্যন্ত কেবল ভারতবর্ষেই টিকে রয়েছে।

হিন্দু সমাজের এই সামাজিক কঠিনতার ঠিক বিপরীতে প্রত্যেক ব্যক্তি আধ্যাত্মিক সাধনার পথে অসীম স্বাধীনতা উপভোগ করতেন। কিন্তু সেমেটিক মতবাদগুলিতে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে ব্যক্তির কোনো স্বাধীনতা কোনোদিনই ছিল না। এই কারণে এই সমস্ত মতবাদে আধ্যাত্মিকতার নামে হেভেন, জন্নত, হেল, জাহান্নুম, জাজমেন্ট ডে, কয়ামত প্রভৃতি কতগুলি অলীক বস্তুর যুক্তিহীন বালখিল্য কল্পনা ছাড়া কোনো গভীর তত্ত্বের বিকাশ ঘটেনি। কিন্তু ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক চেতনার চরম বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

এমতাবস্থায় ভারতবর্ষকে নিজেদের পদানত করার মানসে আগত অহিন্দু মতবাদের প্রচারকরা ভারতবর্ষের এই দুটি ব্যবস্থার (সামাজিক ও আধ্যাত্মিক) উপরে বৌদ্ধিক আক্রমণের পন্থা অবলম্বন করে। বহু শতাব্দীর রাজনৈতিক পরাধীনতা এবং সমাজের উপর বর্বরোচিত অত্যাচারের তাণ্ডবে সমাজে প্রাচীন শাস্ত্রের নামে কিছু কুপ্রথা প্রচলিত হয়। আক্রমণকারীরা এই প্রথাগুলিকে হাতিয়ার করে। তাদের কার্যপ্রণালীর দুটি সুস্পষ্ট ধারা দেখা যায়। প্রথমত, সমাজ সংস্কারের নামে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় অবশ্যপালীয় নিয়মের উপরে মানুষের অনাস্থা সৃষ্টি করা। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে 'মানবতা'র বিরোধী প্রতিপন্ন করা। দ্বিতীয়ত, হিন্দু সংস্কৃতি তথা সমাজ ব্যবস্থার মূলভূত আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তগুলিকে জনমানস থেকে মুছে ফেলে অহিন্দু ভাবধারার প্রবেশ ঘটানো।

এখানে বলা রাখা ভালো যে, হিন্দু সমাজ থেকে কুপ্রথা দূর করে সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য সময়ে সময়ে রামানুজাচার্য, স্বামীনারায়ণ, স্বামী রামানন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, রমণ মহর্ষি প্রমুখ সর্বদা যত্নশীল ছিলেন। তাঁরা হিন্দুত্বকে ভিত্তি করেই এই কুপ্রথা মুক্তির আন্দোলন করেছিলেন। অপরপক্ষে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা হিন্দুত্বকেই কুপ্রথার ভিত্তি বলে প্রচার করে হিন্দুত্বকেই সমাজ থেকে নির্মূল করার চেষ্টা করেছে।

এই আক্রমণের দুটি কার্যধারা পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ধারার অনুসারীরা ভারতীয় শাস্ত্রের বিভিন্ন শব্দ ও তত্ত্বের যথেচ্ছ ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাজকে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। যেমন--- ব্রাহ্ম সমাজ ইত্যাদি। অন্যদিকে আরেক দল আধ্যাত্মিকতাকে উপড়ে ফেলে তার জায়গায় উচ্ছৃঙ্খলতা ও নাস্তিকতা প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা করেছে। যেমন— ডিরোজিও'র নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী থেকে বামপন্থী নকশালরা। এই আক্রমণকারীরা ধীরে ধীরে ব্রিটিশ প্রবর্তিত মেরুদণ্ডহীন কেরানি তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয় আদর্শ ও ভাবধারা সম্পর্কে সমাজের সর্বস্তরে অনাস্থা ও ভ্রান্তি ছড়াতে থেকেছে।

এই ধরনের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে হিন্দু সমাজে আধ্যাত্মিকতা ও তৎসম্পর্কীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ব্যাপ্ত হয়েছে এবং ক্রমশ সমাজের অন্তর্মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু হিন্দু সমাজের প্রাণস্পন্দন হলো হিন্দুত্ব বা হিন্দু সংস্কৃতি। হিন্দু সংস্কৃতির মূল আধ্যাত্মিকতা। সেই কারণে যথাশীঘ্র হিন্দু সমাজ থেকে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত ভ্রান্তিগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের নিরসন ও মূলোৎপাটন জরুরি।

দুশ্চিন্তার কথা হলো, সমাজে পরিব্যাপ্ত কুরীতিগুলিকে দূর করার জন্য বহু সামাজিক ও অধ্যাত্মপ্রেরিত সংগঠন কর্মরত হলেও, আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক ভ্রান্তি নিরসনের প্রয়াস অত্যন্ত নগণ্য। মঠে মন্দিরে পূজা, প্রবচন

ইত্যাদিতে পৌরাণিক কাহিনির কথকতা, ধর্মসভা আদি হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই প্রবচনগুলিতেও প্রচলিত সমস্ত ভ্রান্তির অনুরূপ ব্যাখ্যাই করা হচ্ছে। এর ফলে এই সমস্ত তথাকথিত আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপেও ভ্রান্তি দূর হওয়ার বদলে সেগুলির দৃঢ়ীকরণই হয়ে থাকে। হিন্দু সমাজে বর্তমানে ঈশ্বর, অবতার, দেবতা, উপাসনা, স্বর্গ-নরক, সৃষ্টি ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রচুর ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি রয়েছে।

এমতাবস্থায় এই ভ্রমগুলিকে চিহ্নিত করে যে সমস্ত শব্দ বা তত্ত্ব সম্পর্কে ভ্রম রয়েছে সেগুলির যথাযথ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে সেই ভ্রান্তি নিরসনের প্রয়াস করা দরকার। সমাজের বর্তমান বৌদ্ধিক স্থিতির অনুকূল ভাবে সেই সমস্ত বিষয়গুলির যুগোপযোগী উপস্থাপনা দরকার। এই প্রবন্ধে আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত ধারণার আলোচনা এবং শাস্ত্র অনুসারে তাদের নিরসনের প্রচেষ্টা করব।

হিন্দু সমাজে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে কোনো কঠিন নিয়ম না থাকার দরুন এই বিষয়ে নানা মতবাদের বিকাশ ঘটেছে। যে কোনো ব্যক্তি নিজ রুচি অনুসারে এই মতবাদের অধ্যয়ন, তদনুসারী সম্প্রদায়ে নিজ নিষ্ঠা স্থাপন এবং তদনুসারী উপাসনা পদ্ধতি অনুসরণে স্বাধীন। এই সাধনার ধারাগুলিকে আমরা আপাতত বোঝার সুবিধার জন্য পন্থ নামে চিহ্নিত করলাম। হিন্দু সমাজে আধ্যাত্মিক পন্থগুলিতে তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ :

১. **দর্শন** : শাস্ত্রের বিশেষত বেদের অর্থ নির্ধারণ এবং বেদবাক্যে আপাত ভাবে প্রতীয়মান বিরোধ নিরসন পূর্বক সমন্বয়।

২. **সম্প্রদায়** : প্রাত্যহিক জীবনে অবশ্য পালীয় নিয়মের মধ্যে জীবনকে অনুশাসিত করা। এই নিয়মগুলি উপরোক্ত দর্শনের অনুসারী ধর্মশাস্ত্রে উপনিবদ্ধ থাকে।

৩. **উপাসনা** : দর্শনটিকে যথাযথ ভাবে অনুধাবন করা এবং সত্যকে জানার যথার্থ প্রয়াস।

বর্তমানে ভারতবর্ষে বহু পন্থ প্রচলিত আছে। প্রাচীন পন্থগুলির মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে অদ্বৈতমত অত্যন্ত সংগঠিত ও প্রবল। ভগবান শঙ্করাচার্য সমাজ জীবনে সফলভাবে অদ্বৈত ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এছাড়াও নিম্বার্কাচার্য, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য, স্বামীনারায়ণ, রামানন্দ, চৈতন্য, উপলদেব প্রমুখ আচার্য বিভিন্ন পন্থকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁরা

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারী সমস্ত পন্থই ঈশ্বরের স্বরূপের বিষয়ে একমত। ঈশ্বর সর্বশক্তিসম্পন্ন, অজ্ঞান রূপী মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত, পূর্ণ জ্ঞান এবং অনন্ত বিভূতি সম্পন্ন। সম্পূর্ণ সৃষ্টিই ঈশ্বরের শরীর। এই সমগ্র চরাচরে ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই নেই।

সকলেই ঈশ্বর, অবতার, দেবতা প্রভৃতি বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্ত সমূহ যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ও দর্শনগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও কোনো দর্শনেই সৃষ্টির একাত্মতার বিরোধিতা করা হয়নি। সকলেই নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারে সৃষ্টির একাত্মতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ সৃষ্টিকে ঈশ্বরের থেকে অভিন্ন বলেছেন, কেউ-বা সৃষ্টিকে ঈশ্বরের শরীরের অংশ বলেছেন, কেউ-বা সৃষ্টিকে ঈশ্বরের লীলা বলে সৃষ্টিতে সমস্ত বৈষম্যের নিন্দা করেছেন।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্তিগুলিকে নির্দেশ করে শঙ্করাচার্য প্রচারিত অদ্বৈত মত অনুসারে সেগুলির নিরসনের প্রয়াস করব।

ঈশ্বর বিষয়ক ভ্রান্তি :

১. ঈশ্বর বিষয়ে প্রবলতম ভ্রান্তিটি হলো—'ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম...'। এই বাক্যটির সহজ তাৎপর্য হলো, হিন্দুশাস্ত্রানুসারী পন্থগুলিতে যে ঈশ্বরের উপাসনা হয় ইসলাম, খ্রিস্টান প্রভৃতি সেমেটিক মতাদর্শেও সেই ঈশ্বরেরই উপাসনার কথা বলা হয়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। (৪/১১)

যে আমাকে যেই রূপে ভজনা করে আমি তাকে সেই রূপেই ভজনা করি। হে পার্থ, সকলেই আমার নির্দেশিত পথেই চলেছে।

এই শ্লোকে ভগবান নিজেই সমস্ত প্রকার উপাসনাকেই তাঁর উপাসনা বলে নির্দেশ করেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও এই কথারই অনুবাদ করেছেন, 'যত মত তত পথ'। সুতরাং কেউ যদি গড, আল্লাহ্ ইত্যাদি নামে কোনো গ্রন্থে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে তাকে ডাকে সে আসলে ঈশ্বরেরই উপাসনা করছে।

২. হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গাতে ঈশ্বরের বিভিন্ন মূর্তি বা রূপকল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমস্ত রূপকল্পের মধ্যে কিছু রূপকল্প একেবারে অলীক ও অবাস্তব বলেই মনে হয়। যেমন, অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। সুতরাং সংশয় তৈরি হয় যে, ঈশ্বরের এই ধরনের রূপকল্পনা ভ্রান্ত। আসলে ঈশ্বর নিরাকার এবং নিরাকারেরই উপাসনা করা উচিত। বেদেও বলা হয়েছে, 'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্' (কঠোপনিষৎ ১/৩/১৫) অর্থাৎ তিনি শব্দ, স্পর্শ রূপ রহিত অব্যয়। এই সমস্ত বাক্যে ঈশ্বরের নিরাকারতাই প্রতিপাদিত হয়েছে। সেমেটিক মতাদর্শগুলিতেও ঈশ্বরকে নিরাকার প্রতিপাদন করা হয়েছে। সুতরাং এই নিরাকার উপাসনাই আসলে হিন্দুশাস্ত্রে প্রতিপাদিত এবং সেটির সঙ্গে সেমেটিক মতের কোনো বিরোধ নেই। অন্য সমস্ত রকম সাধনার ধারা আসলে ভ্রান্ত।

এই দুটি ভ্রান্তির নিরসন ঘটলে অন্যান্য বহু ভ্রান্ত ধারণা স্বতঃ নিরস্ত হবে। এই দুটি হলো ঈশ্বর বিষয়ক সমস্ত ভ্রান্তি এবং বিভ্রান্তির ভিত্তিভূমি।

ঈশ্বরের স্বরূপ—শাস্ত্র কী বলছেন :

বস্তুত, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারী সমস্ত পন্থই ঈশ্বরের স্বরূপের বিষয়ে একমত। ঈশ্বর সর্বশক্তিসম্পন্ন, অজ্ঞান রূপী মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত, পূর্ণ জ্ঞান এবং অনন্ত বিভূতি সম্পন্ন। সম্পূর্ণ সৃষ্টিই ঈশ্বরের শরীর। এই সমগ্র চরাচরে ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই নেই। ঈশ্বর সমস্ত জীবের মধ্যে বৈশ্বানর (গীতা ১৫/১৪) এবং অন্তর্যামী (গীতা ১৮/৬১) রূপে নিবিষ্ট হয়ে আছেন। যাদেরকে আমরা জড় বলি তাদের মধ্যেও চৈতন্য রূপে তিনি অনুস্যূত।

এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত। ঈশ্বরের উপাসনার মার্গ ভিন্ন হলেও স্বরূপত, ঈশ্বর এক এবং তিনি

সমস্ত উপাসককেই কৃপা করেন।

হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও ঈশ্বরের সাকারত্বের নিষেধ করা হয়নি। হিন্দুশাস্ত্র মতে ঈশ্বর নিজ ইচ্ছা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকটিত হতে পারেন। তিনি কোনো নির্দিষ্ট রূপে, নির্দিষ্ট আকারে, এমনকী নিরাকারতায়ও সীমিত নন।

বস্তুত, এই আকার হলো মায়িক। মায়া বা অজ্ঞান থেকেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং নামের উৎপত্তি। মায়ার অধীনস্থ জীব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রূপ এবং নাম গ্রহণ করে। কিন্তু ঈশ্বর মায়ার অধীন নন। বরং মায়া ঈশ্বরের অধীন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে—

অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বম্ এতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি
মায়িনং তু মহেশ্বরম্।।(৪/৯-১০)

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য বলছেন—''নিজের মায়ায় কল্পিত এই পাঞ্চভৌতিক প্রপঞ্চে মায়ার দ্বারাই নানা রূপে বদ্ধ হয়ে অবিদ্যার বশবর্তী হয়ে সংসার সমুদ্র ভ্রমণ করছেন। জগতের কারণ স্বরূপ প্রতিপাদিত প্রকৃতিই হলো মায়া। মহান ঈশ্বর হলেন মহেশ্বর। তাঁকে মায়ী বলে জানবে অর্থাৎ মায়ার সত্তা এবং স্পন্দনের কারণ, মায়ার অধিষ্ঠান, মায়ার প্রেরক রূপে জানবে। এই পরমেশ্বরই দড়িতে কল্পিত সর্পের ন্যায় মায়িক অবয়বের আরোপ দ্বারা ভূলোক আদি সমস্ত প্রপঞ্চে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন।''

অর্থাৎ ঈশ্বর নিজ মায়া দ্বারা সৃষ্টি রচনা করে সেই সৃষ্টিতে স্বয়ং ব্যাপ্ত হয়েছেন। ঈশ্বর তাঁর অধীনস্থ মায়ার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি রচনা করেন। সমস্ত দেহ, ইন্দ্রিয় থেকে শুরু করে সমস্ত প্রকৃতিই ঈশ্বরের বশীভূত। ঈশ্বর নিজ মায়াকে আশ্রয় করে ইচ্ছানুরূপ বহু রূপ ধারণ করেন। মহর্ষি বাদরায়ণ বিরচিত ব্রহ্মসূত্রের 'অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ' (১/১/২০) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য আরও বলেছেন—''পরমেশ্বর সাধকের অনুগ্রহের জন্য মায়াময় রূপ ধারণ করতেই পারেন... যেখানে সমস্ত বিশেষণের নিরসন পূর্বক পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে উপদেশ হলো 'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্' ইত্যাদি। আবার সমস্ত কিছুর কারণভূত হওয়ার জন্য কিছু বিকারধর্ম বিশিষ্ট ঈশ্বরকেও উপাস্যরূপে নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন— 'সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ' (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩/১৪/২) ইত্যাদি।''

সুতরাং মায়ার অধিপতি সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ঈশ্বরের সাকারতাতে শাস্ত্রের কোনো বিরোধ নেই। সেজন্য শ্রুতির বিভিন্ন অংশে, স্মৃতিতে, পুরাণে ঈশ্বরের যে সাকারত্ব এবং বিভিন্ন রূপকল্পনা করা হয়েছে তাতে কোনো অযৌক্তিকতা নেই। নিরাকার ঈশ্বর মায়ার সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হন।

সেমেটিক মতের সঙ্গে বিরোধ :

এমতাবস্থায় ঈশ্বর সম্পর্কে সেমেটিক বিচারধারা হিন্দু ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সেমেটিক মতে ঈশ্বর নিরাকার। ঈশ্বরের সাকারত্ব কল্পনা সেমেটিক মতে অক্ষম্য অপরাধ। বাইবেলের বহু জায়গাতে ঈশ্বরের কোনো নির্দিষ্ট রূপের উপাসনার নিষেধ করা হয়েছে। যেমন— ''Theerfore, my dear friends, flee from idolatry." Corinthians 10 : 14; "Dear children, keep yourselves from idols." John 5 : 21. ইত্যাদি। এছাড়াও বাইবেলের Leviticus 19 : 4, Corinthians 10 : 7, Colossians 3 : 5, Isaiah 45 : 20, Judges 10 : 14, Leviticus 10 : 4, Galatians 4 : 8, Isaiah 44 : 9-20 প্রভৃতি স্থানে ঈশ্বরের মূর্তি কল্পনার নিষেধ করা হয়েছে। এমনকী বাইবেলে এটিকে পাপ বলে নির্দেশ করে তাকে এই প্রথাকে সমাপ্ত করার জন্যও উস্কানি দেওয়া হয়েছে— ''Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature : sexual immorality, impurity, lust, evil desires and freed, which is idolatry." (Colossians 3 : 5)।

একই ভাবে ইসলামেও ঈশ্বরের মূর্তি কল্পনাকে শির্ক বলা হয়েছে। ঈশ্বর অতিরিক্ত কারও উপাসনার নিষেধ করা হয়েছে কোরানে। ''যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে। অতএব, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত এসব তোমরা জান।'' (সুরা আল বাকারা (২), আয়াত ২২) ''তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো উপাস্য সাব্যস্ত করো না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'' (সুর যারিয়াত (৫১), আয়াত ৫১)। ''এবং তারা আল্লাহ্‌র জন্য সমকক্ষ স্থির করেছে, যাতে তারা তার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। বলুন, মজা উপভোগ করে নাও। অতঃপর তোমাদেরকে অগ্নির দিকেই ফিরে যেতে হবে।'' (সুরা ইব্রাহীম (১৪), আয়াত ৩০) (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত মৌলানা মহিউদ্দিন খানের অনুবাদ)।

বাইবেলও ঈশ্বরের সাকারত্ব কল্পনাকে পাপ বলেছে, ''Those who cling to worthless idols turn away from God's love for them." (Jonah 2.8)।

অন্যদিকে হিন্দুশাস্ত্র বলছে, ঈশ্বর স্বয়ং সাধকের অনুগ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেন। এই রূপগুলি উপাসনার জন্যই প্রসিদ্ধ। এই রূপ বা মূর্তির উপাসনাতে সাধকের কল্যাণই হয়। গীতাতে ভগবান বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।। (৯/২৩)

যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্য দেবতাদের উপাসনা করে তারাও অজ্ঞানতার বশেই আমারই (অর্থাৎ পরমেশ্বরেরই) উপাসনা করে। (এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, পূজা বা যজ্ঞ মাত্রই উপাসনা নয়। পূজা বা যজ্ঞ কাম্যকর্মও হতে পারে আবার উপাসনাও হতে পারে। এই শ্লোকে উপাসনার কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা থেকে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির কারণে বিরত থাকলাম।)

সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র মতে বিভিন্ন রূপে ঈশ্বরের উপাসনা সাধকের কল্যাণ করে। অন্যদিকে সেমেটিক মতাদর্শে কোনো রূপের উপাসনা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ এবং সেটি পাপ।

সেমেটিক মত অনুযায়ী ঈশ্বরের রূপকল্পনাকারী এবং রূপবিশিষ্ট ঈশ্বরের উপসনাকারী অনন্তকাল দোযখের আগুনে পড়ে থাকবে। অন্যদিকে হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী উপাসক যে কোনো রূপেই ঈশ্বরের উপাসনা করুক না কেন ঈশ্বর তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে সংসার সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেন। সেমেটিক মত অনুসারে ঈশ্বরের উপাসনার মাধ্যমে উপাসক স্বর্গে যায় এবং অনন্তকাল স্বর্গ ভোগ করে। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে স্বর্গ মোটেই লোভনীয় কিছু নয়। বরং স্বর্গও আসলে বন্ধন। ঈশ্বরের উপাসনাকারী এই স্বর্গ, নরক-সহ সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেমেটিক মতে ঈশ্বর উপাসককে অনন্ত ভোগ দান করেন। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে উপাসককে ঈশ্বর সমস্ত ভোগ থেকে মুক্ত করেন।

সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত ঈশ্বরকে কোনোভাবেই সেমেটিক গ্রন্থসমূহে প্রতিপাদিত ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। তাই সমাজ থেকে 'ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম' ইত্যাদি বিভ্রান্তি দূর হওয়া প্রয়োজন। ■

বীর সাভারকরের সংগ্রামী জীবনের মূল্যায়ন খুবই জরুরি

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বস্তিকার ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় পূর্বতন সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক ড. বিজয় আঢ্য বীর সাভারকর সম্পর্কিত গ্রন্থের (আজন্ম কারাবাস— ভি.ডি. সাভারকর। হিন্দু মহাসভা প্রকাশন কলকাতা) পর্যালোচনা একাধারে সুচিন্তিত ও সুলিখিত। হিন্দু মহাসভা প্রকাশন বহুদিন আগে প্রকাশিত গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ করে এক সময়োচিত দায়িত্ব পালন করেছেন। বাঙ্গলার এখনকার অনেকে সঠিক মূল্যায়নে আগ্রহী নন। পরিতাপের বিষয়, বুদ্ধিজীবী নামে কথিত ব্যক্তিরাও নিজ নিজ আবর্তে নিমজ্জিত— স্বাধীন ও যুক্তিবাদী চিন্তায় আগ্রহী নন।

কিন্তু স্মরণে রাখা প্রয়োজন, জাতীয় বিপ্লবীকাণ্ড ভারতের মুক্তি সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ দিক। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারতীয় বিপ্লবীদের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। প্রত্যেক বিপ্লবী সম্পর্কে আলাদা গোপন ফাইল থাকতো। বীর সাভারকর সত্য সত্যই ছিলেন বিপ্লবীদের মধ্যে অনন্য। তিনি ব্রিটিশের মনে এমন ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন যে তাঁকে নির্ধারিত সময়ের থেকে অনেক বেশি দিন আন্দামান সেলুলার জেলে এক ভয়ংকর ও নির্মম পরিবেশে দিন কাটাতে হয়েছে। প্রায় দেড় দশক আগে স্বস্তিকা পত্রিকায় সাভারকর সম্পর্কে আমার রচিত একটি বড়োমাপের লেখা বেরিয়েছিল, সেই লেখার শিরোনাম ছিল 'জীবন যেন দেই আহুতি মুক্তি আশে'।

সাভারকর নিয়ে লিখতে হঠাৎ আগ্রহী হলাম কেন? এর মূলে দুটি বিষয় উল্লেখ করতে পারি। প্রথমত, ১৯৬৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ৮৩ বছর বয়সে বীর সাভারকর প্রয়াত হন। পরের দিন বোম্বাইয়ে শোকাতুর বিশাল জনতা শোকমিছিলে অংশ নেন। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর অল্প বয়স থেকেই সাভারকরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বোধ করি সর্বস্তরের মারাঠিরা তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। সম্প্রতি ২৬ ফেব্রুয়ারি সাভারকরের প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়েই দিনটি চলে গেল। সাভারকরের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য লেখাটি চয়ন করলাম। দ্বিতীয়ত, ড. বিক্রম সম্পত নামে এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক দীর্ঘদিন ধরে দেশে বিদেশের সমস্ত প্রামাণ্য তথ্য চয়ন করে সাভারকর সম্পর্কে দুই খণ্ডে প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ লিখেছেন। গ্রন্থটির নাম 'Savarkar–A contested legacy'। বিশালাকায় গ্রন্থ দুটি যথাক্রমে ২০১৯ ও ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়। যারা সাভারকরের গুণগ্রাহী আর যারা কট্টর সমালোচক দু' তরফের ব্যক্তিরা গ্রন্থটি নাড়াচাড়া করে দেখবেন। লেখক সাভারকরের বিপ্লবী জীবন, আন্দামানের কারাকাহিনি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের অস্থির দিশেহারা সময়কাল এবং স্বাধীনতার পর গান্ধীজীর হত্যা ও সাভারকরের কারাদণ্ড ও দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া— সব দিকগুলিই প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে। দীর্ঘ জীবনে (১৮৮৩-১৯৬৬) সাভারকর ছিলেন সংগ্রামী জাতীয়তাবোধের জ্বলন্ত মশাল। বাল্য বয়সে সাভারকরের সংগ্রামী জীবন শুরু হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তিনি বিপ্লববাদের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন। তারপর ১৯১০ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত দীর্ঘ কারাবাস পর্ব। এরপর তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেন। প্রথমেই তিনি হিন্দু জাতীয়তাবোধের পুরোধা হিসেবে পরিচিত হন। ১৯৩৭ সালের পর ভারতের জাতীয় চেতনাকে সক্রিয় ও গতিশীল করার উদ্দেশ্যে ইতিবাচক সক্রিয় কার্যক্রম তুলে ধরেন। স্বাধীনতার পর গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত হন এবং স্বাধীন ভারতে কারাবন্দি হন। কিন্তু গান্ধী হত্যা মামলায় আজীবন তাঁকে সংযুক্ত করা হয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে অন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীরা স্বাধীনতার পর ক্ষমতার মসনদে উপবিষ্ট হন, আর সাভারকর কী ব্রিটিশ শাসনে কী স্বাধীন ভারতে অভিযুক্ত আসামির তকমা পেয়েছেন। তাই তাঁর সমগ্র জীবন ছিল 'জীবন যেন দেই আহুতি মুক্তি আশে।'

সাভারকর ছিলেন একাধারে সংগ্রামী বিপ্লববাদের প্রতীক, আবার অন্যদিকে তিনি স্বাধীন ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় ইতিবাচক দিক নির্দেশক। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণকে সংস্কার ও সংহতির পথে এগোতে হবে। তা না হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দাপট ও মুসলমান সম্প্রদায়ের উগ্র বিভেদকামী তৎপরতা প্রতিরোধ সম্ভব নয়। তাই অসহযোগ গণ-আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ার পর ১৯২০-র দশকে সাভারকর যেমন হিন্দুত্বের আদর্শ চয়ন করেছিলেন, অন্যদিকে নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করার ভাবনা তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর (১৯৩৯) ভারতীয় রাজনীতিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। জাতীয় কংগ্রেস দোদুল্যমান অবস্থান গ্রহণ করল। শেষপর্যন্ত জাপান দক্ষিণপূর্ব এশিয়া নিয়ন্ত্রণে আনায় কংগ্রেস ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিল আর শীর্ষ নেতারা কারারুদ্ধ হয়ে নিজেদের নিষ্ক্রিয় করলেন। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের মদতে মুসলিম লিগ বিচ্ছিন্নতাবাদী দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচারে সরব হলো।

এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে সাভারকর নীরব দর্শক হয়ে রইলেন না। একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং অন্যদিকে মুসলিম লিগের আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর স্বার্থে তিনটি প্রধান দাবি পেশ করলেন। প্রথমত, অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীন দেশের মর্যাদা দিতে হবে, তা না হলে ভারতের পক্ষে সঠিকভাবে যুদ্ধসংকটের মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে এই মর্মে লিখেছিলেন। দ্বিতীয়ত, ভারতবাসীকে দ্রুত সামরিকীকরণের সুযোগ দিতে হবে। তা না হলে বাইরের আক্রমণ ও ভেতরের নিস্পৃহতা কাটানো যাবে না। তৃতীয়ত, সামরিকীকরণের পাশাপাশি চাই শিল্পায়ন। সামরিক শক্তি আর অর্থনৈতিক শক্তি মজবুত না হলে ভারতে সঠিক বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে না। দুরদর্শী সাভারকর বুঝেছিলেন সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সুদৃঢ় না হলে একটি দেশ নিজেকে দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করতে পারবে না। উল্লেখ্য, স্বাধীন ভারতে পাকিস্তান ও চীনের আক্রমণে ভারত নাজেহাল হয়ে পড়েছিল।

ভারত এখন সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বৈত পথ গ্রহণ করেছে। তাই পরাধীন ভারতে ও স্বাধীন ভারতে সাভারকরের ঐতিহ্য সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। ভারত এখন সমগ্র বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

এই মারণ যুদ্ধ কি থামবে?

পশ্চিমিরা নাকি সুসভ্য, উন্নত জীবন যাত্রার অধিকারী। গায়ের চামড়া সাদা বলে তাদের কত গর্ব। আমাদের মতো কালো চামড়ার দেশগুলো থেকে দলে দলে প্রতি বছর কত লোক ওই সুসভ্য পশ্চিমি দেশগুলোতে পাড়ি জমায়। সেখানে কেউ ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন নিয়ে পড়তে যান। বিদেশ থেকে একটা ডিগ্রি পাওয়াকে জীবনে সেরা পাওয়া বলে তারা মনে করেন। বিদেশ থেকে ডিগ্রি পেলে তাদের পসার বেড়ে যায় এখানে। কাক থেকে কোকিল হয়ে উঠতে তাদের সাধ জাগে।

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে এখন ডাক্তারি পড়ুয়ারা প্রাণ বাঁচাতে দেশে ফিরতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। এতো ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে বিশেষ করে ইউক্রেনে পড়তে যান জেনে ভারত সরকার হতবাক। প্রতি বছর কেন এতো ছাত্র-ছাত্রী ইউক্রেনে পড়তে যায়? ভারতের মতো জনবহুল দেশে ডাক্তারদের সংখ্যা কম হওয়ায় ডাক্তারদের চাহিদা চিরকাল থাকে। এখানে ডাক্তারি পড়ার আসন খুব সীমিত সংখ্যক। অনেকে সুযোগ পান না। তাই তারা বিদেশে পাড়ি দেন। আশা করি এই যুদ্ধ থেকে সরকার শিক্ষা নেবে। মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বাড়ালে এতো ছাত্র-ছাত্রীর বিদেশে পাড়ি জমানো নিশ্চয় বন্ধ হবে।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেদেশের সরকার ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। তারা ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে, কারণ ভারত সরকার তাদের কোনো সামরিক সাহায্য দিচ্ছে না। যদিও ভারত মানবিক সাহায্যের জন্যে অন্ন, বস্ত্র, ওষুধ পাঠাচ্ছে। ভারত সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়ে রাশিয়া আট ঘণ্টা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের সেফ জোনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। এটা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বড়ো কূটনৈতিক সাফল্য বলা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ভারত কেন নিরপেক্ষতা অবলম্বন করছে? ভারত কোনও দেশকে আক্রমণ করে কখনো কোনও যুদ্ধ করেনি। ভারত চিরশান্তির তপোভূমি।

নৃতত্ত্ববিদরা হিসেব কখনো মেলাতে পারে না। একই ধর্ম একই খাদ্য, একই আবহাওয়া, ভাষা প্রায় এক, তবুও কেন এতো আত্মঘাতী জাতিসংঘর্ষ পশ্চিমি দেশগুলোতে। আমাদের বহুত্ববাদের দেশে এরকম কখনো ভাবা যায় না। অবশ্য তার কারণ লুকিয়ে আছে আমাদের বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের মতো সুপ্রাচীন ত্যাগময় দর্শনে। ভারতই পারে মুক্তির পথ দেখাতে। তাই সবাই মুক্তি খোঁজে ভারতের হাত ধরে। এই মারণ যুদ্ধ বন্ধ করে ভারতের হাত ধরে পশ্চিমি পৃথিবী শাপ মুক্ত হোক।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

পাঠ্যপুস্তকে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা

বর্তমানে বাংলায় সমস্ত ধরনের পাঠ্যপুস্তকে আবশ্যিকভাবে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা দুটি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বাস্তবে দেখা যায় যে, কোনো বিদ্যালয়ের কোনো ক্লাসেই এই প্রস্তাবনাটি পড়ানো হয় না। আবার এও ঠিক যে, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে যে প্রস্তাবনা নেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা কিন্তু নয়। হুবহু তা আজ আর নেই।

১৯৭৬ সালে ৫৯টি অনুচ্ছেদ সংবলিত ৪২তম সংবিধান সংশোধন করা হয়। ফলে সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শব্দদুটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা ১৯৪৯ সালে ছিল না। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এ বিষয়ে কোনো কিছুই জানেন না, কিন্তু পড়াতে তো কোনো আপত্তি নেই, না বুঝেই পড়ানো হয় না।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর।

রাধাকৃষ্ণনের অধ্যাত্মভাবনা

২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় নিখিল চিত্রকরের লেখা 'হিন্দুত্বে কালিমালেপন এখনকার ইনটেলেকচুয়াল ট্রেন্ড'-এর সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু আমি আরও ব্যঙ্গাত্মক হিসেবে বলতে চাই--- 'ইনটেলেকট্' হলো 'আঁতেল'— তাই এটা 'আঁতেলেকচুয়াল' ট্রেন্ড। বিশ্ববিখ্যাত বাঙ্গালি ব্যক্তিদের এই সম্পর্কে বক্তব্যগুলিকে নস্যাৎ করাই এই অতি তীব্র 'আঁতেল'দের কাজ। চলুন একটু পুরানো সময়ে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। দু' হাজার টাকা বেতন পেতেন অধ্যাপক হিসেবে। তাই তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েও মাত্র দু' হাজার টাকা নিতেন। বাকি ৮ হাজার টাকা দেশ গঠনের কাজে ব্যয় করতেন।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিল সিমলার লাটভবন নিয়ে। ইংরেজ আমলে বড়োলাটেরা দিল্লির গরম থেকে মুক্তি পেতে সিমলায় চলে যেতেন সপারিষদ। সেই কারণে সিমলায় গড়া হয়েছিল বিরাট প্রাসাদ, সেইসঙ্গে ছিল বড়োলাটের অস্থায়ী অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ি। বছরে দু' তিনমাস এগুলি ব্যবহার হতো। এসব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ হতো বিশাল অঙ্কের টাকা। সেই ব্যবস্থাকে তিনি রদ করেন। ড. রাধাকৃষ্ণন তাঁর অধ্যাপনার সময়কালে ১৯২৬ সালে হিন্দু জীবনদর্শন সম্পর্কে কী বলেছিলেন। ১৯২৬ সালে 'অ্যাপট্রন বক্তৃতা' দেবার জন্য রাধাকৃষ্ণনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। হিন্দুজীবন ও দর্শন ছিল তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু। চিরকাল ঈশ্বর এবং ভাগ্যে বিশ্বাসী রাধাকৃষ্ণন অবশ্য একে তাঁরই করুণা বলে মনে করেন। ম্যানচেস্টার কলেজে রাধাকৃষ্ণন 'অ্যাপট্রন স্মারক বক্তৃতায়' যে ভাষণ দেন তাতে বিমুগ্ধ হন সবাই। তিনি বলেন, 'অ্যাপট্রন বক্তৃতামালায় আমি হিন্দুজীবন দর্শনকে একটি আন্দোলন হিসেবে দেখতে চেয়েছি। নিঃসন্দেহে সে

আন্দোলন ঐতিহাসিক এবং প্রগতিশীলও। সেই সঙ্গে আমি এটাও দেখাতে চেষ্টা করি যে, সে আন্দোলন এখনও সজীব। সেই আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি এখনও বর্তমান। সেখানে আমি আরও বলেছি, হিন্দু ধর্মানুশীলনকারীরা নদীগর্ভের পলিমাটির মতো কোনো অনড় কঠিন পদার্থের রক্ষক নন— তাঁরা হলেন দ্রুত চলমান জ্বলন্ত মশালধারী পথ নির্দেশকারীর দল'।

সেই সময় এই ভাষণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করার দাবি ওঠে। কারণ যত বেশি মানুষ বিষয়টি জানতে পারবে ততই খসে যাবে অজ্ঞতার খোলস। হিন্দুধর্ম ও জীবন দর্শন সম্পর্কে যেসব অপপ্রচার আছে, যেসব ভুল ধারণা আছে তা এর ফলে দূর হবে। ভাষণটি বই আকারে প্রকাশের ব্যাপারে রাধাকৃষ্ণনের কোনো আপত্তি ছিল না। ফলে ১৯২৭ সালে ইংল্যান্ডের পুস্তক প্রকাশ সংস্থা অ্যালেন আনউইল লিমিটেড রাধাকৃষ্ণনের এই বক্তৃতামালা 'দি হিন্দু ভিউ অব লাইফ' নামে প্রকাশ করে। বইটি প্রকাশের পর পরই এর চাহিদা এমন বেড়ে যায় যে পরবর্তীকালে অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়েছে।

রাধাকৃষ্ণন চিরকালই মনে করতেন এক অদৃশ্য শক্তি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাঁর গতি নিয়ন্ত্রণ করছে। 'কেন জানি না, আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই আমার মনে হতো, এই আপাত দৃশ্য মানব জগতের সাহায্যে যে জগতকে দেখা যায় না, তাকে দেখতে হয় মানস চোখে। এমনকী যখন দারুণ বিপদের মধ্যে পড়েছি তখনও আমার এই বিশ্বাস এতটুকু শিথিল হয়নি।'

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ের ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকটি সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন বলেন, ওই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে আমাকে সর্বত্র দেখে এবং আমার মধ্যেই সবকিছুকে দেখে তার কাছে আমি হারিয়ে যাই না আর সেও আমার কাছে অপ্রকাশ হয় না।

শ্লোকটির এই সাধারণ অর্থকে বিস্তার করে রাধাকৃষ্ণন লিখেছিলেন, 'তাঁর কাছে আমিও হারাই না, আর তিনিও আমার কাছে হারান না। ওই সস্নেহ মর্মস্পর্শী মহাবাণীতে অতীন্দ্রিয়তার চেয়েও ব্যক্তিগত বাস্তব জীবন রহস্যের উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। সগুণ ঈশ্বরের সঙ্গে জাগতিক সকল বস্তুর গভীর ঐক্যের কথাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে।' ব্রহ্মসংস্পর্শের অনুভূতি প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, 'এই অনুভূতি যত বেশি গভীর ঐক্যবোধক হবে ততই তা হবে সার্বিক বা সার্বজনীন। আত্মা যত গভীরে প্রবেশ করবে তার উপলব্ধিও ততই প্রসারিত হবে। আমরা যখন আমাদের অন্তর্দেবতার সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারব, তখন বিশ্বের সামগ্রিক জীবন প্রবাহের সঙ্গেই আমরা নিঃশেষে মিশে যেতে পারব।'

—দীপক খাঁ,
পাটপুর, বাঁকুড়া।

'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?'

মুসকান নামের এই মেয়েটি স্কুল-কলেজের নিখাদ বন্ধুত্বের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এক ইতিহাস রচনা করল। সত্যিই তা প্রশংসার যোগ্য বটে! তোমার সঙ্গে যারা ছিল এবং তোমার পিছনে যারা ছিল তাদের সকলকে প্রথমে জানাই আমার অশেষ ধন্যবাদ। আমরা ছোটোবেলা থেকে হিন্দু পরিবারের ছেলে-মেয়েদের কট্টর ধর্মশিক্ষা দিই না। কিন্তু স্কুল-কলেজ থেকেই এবার আর যাই হোক হিন্দু ছেলে-মেয়েদের হিন্দুত্ববোধ গড়ে উঠবে যা এতদিন তারা ভাবেনি এবং যে শিক্ষা আমরা এতদিন তাদের দিতে পারিনি। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্বার্থবাজ কংগ্রেস তোমাকেও।

স্কুল-কলেজ থেকে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি হোক, এতে পরবর্তী হিন্দু প্রজন্ম শিক্ষালাভ করবে ও লাভবান হবে।

ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাবুন ছোটোবেলা থেকে আমাদের হিন্দু ছেলে-মেয়েরা যখন স্কুলে যাবে তখন তারা মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, তাদের কিছু বন্ধু স্কুলে ধর্মীয় পোশাক কেন পরে আসে? উত্তরে আপনি কী বলবেন, ওরা মুসলমান। তারা কেন আলাদা ইউনিফর্ম পরে? মা-বাবা অথবা শিক্ষক যার কাছেই প্রশ্ন উত্থাপিত হবে, কী উত্তর দেবেন : আমরা হিন্দু। 'ব্যাস কেল্লা ফতে...' বিষ ঢুকতে থাকবে... ওরা মুসলমান, আমরা হিন্দু। হিন্দু ছোট্ট ফুলের কুঁড়িটি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমোর এই বিভাজন ভুলে যাবে। কেননা স্কুল এদের এই শিক্ষা দিয়ে দেবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সবাই একই ইউনিফর্মের সুতরাং তোমাদের মধ্যে আর কোনো ভেদাভেদ নেই তোমরা সবাই হিন্দু। 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন' এই লাইনটি শুধু তখন অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।

ছোটোবেলা থেকেই শুরু হয়ে যাবে ঠাণ্ডা লড়াই। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ ছোটোবেলা থেকেই তাদের মনে গেঁথে যাবে। মাঝেমধ্যেই এ নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হবে, মারপিট হবে। এটাই ভবিতব্য। স্কুল-কলেজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। এই লড়াই হবে অত্যন্ত সেনসিটিভ গ্রাউন্ডে, ফলে দেখতে থাকুন হিন্দু একত্রিত হতে বাধ্য হবে। হিন্দুর লড়াকু মনোভাব তৈরি হবে ছোটোবেলা থেকে, পরবর্তীকালে যা তাদের অধিকার আদায় করে নিতে ক্ষমতাশীল ও শক্তিমান করে তুলবে। হিন্দু সন্তান মার খেলে হিন্দুত্ববোধশূন্য উদাসী মা-বাবা মুসলমান বিরোধী হবে, আর মেয়ে এলে তাকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তখনই সেকুলারিজমের ভূত ছোটোবেলাতেই সন্তানের কেটে যাবে এবং মাঝ বয়সে মা-বাবারও চেতনা হবে। আমি মনেপ্রাণে তাই হিজাব আন্দোলনের পক্ষে। 'অতি চালাকের গলায় দড়ি' আমাদের পূর্বপুরুষদের এই প্রবচনের উপর আস্থা রাখুন।

—স্বরূপ কুমার ধবল,
পুরুলিয়া।

With Best Compliments from -

A
Well wisher

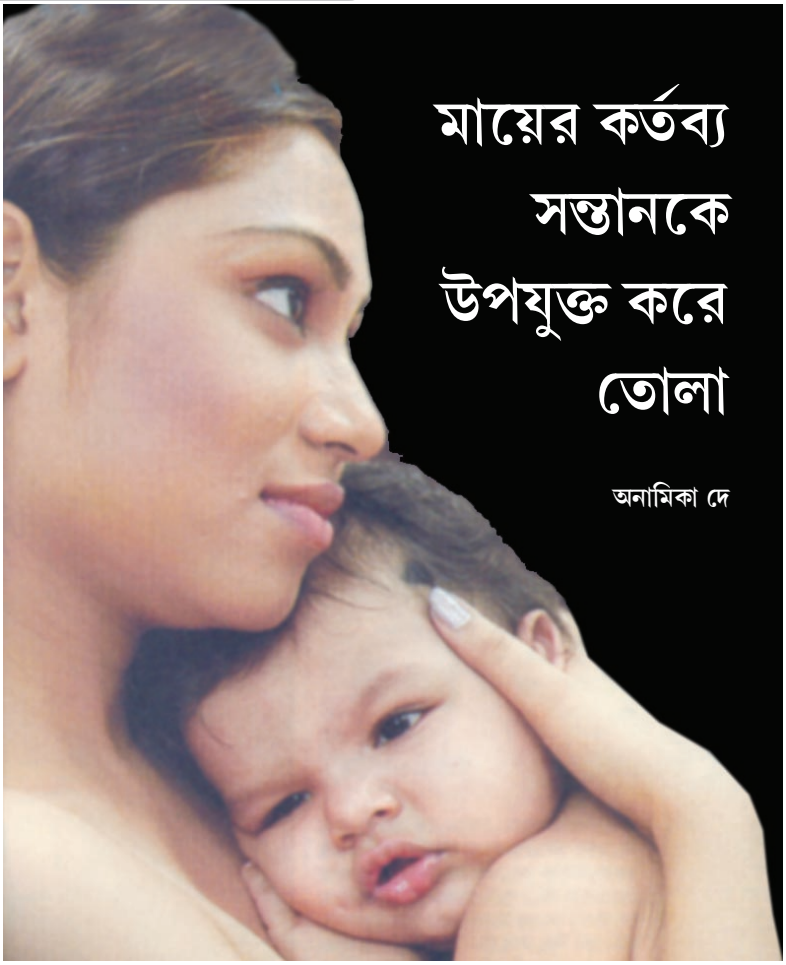

মায়ের কর্তব্য সন্তানকে উপযুক্ত করে তোলা

অনামিকা দে

'মা হওয়া নয় মুখের কথা।' এই কথাটা শুনে আসছি আমরা ছোটো থেকে। ন'মাস দশদিন গর্ভে ধারণ করে প্রসব যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তবে একটি সন্তানের জন্ম দেন মা। প্রায় ছ' মাস সদ্যজাত শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে বড়ো হয়। মায়ের আদর যত্নে ছোট্ট সোনা একটু একটু করে বড়ো হয়ে ওঠে। মায়ের চোখ দিয়ে পৃথিবীর রূপ রস গন্ধকে চেনে। কিন্তু মায়ের কর্তব্য কি শুধু এই পর্যন্তই? —না, ভূমিষ্ঠ সন্তান আগামী দিনের ভবিষ্যত। সুসংস্কারে বড়ো হওয়া শিশুর জীবনের মূল্যবোধ তৈরি হয় পরিবারের হাত ধরে। যেখানে মায়ের ভূমিকাই সর্বাধিক। কারণ একটি শিশু বেশিরভাগ সময়টাই মায়ের কাছে থাকে। তাই মায়ের দেওয়া শিক্ষাই তার চারিত্রিক গঠনের মূল আধার।

এবার একটি ছোট্ট গল্প বলবো। সন্ধে প্রায় সাতটা বাজে। শহরের ব্যস্ততায় মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন ফুটপাতে খাওয়ার দোকানে মানুষ ভিড় করে রাস্তার খাবার খেতে ব্যস্ত। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি বাচ্চা ছেলে মোমো খাবে বলে মায়ের কাছে বায়না জুড়েছে। প্রথমে 'রাস্তার খাবার খেতে নেই' বলে মা বোঝানোর চেষ্টা করলেন, বাচ্চাটি নাছোড়বান্দা। যাইহোক, মহিলা মোমোর দোকানের সামনে গিয়ে দোকানদারকে এক প্লেট চিকেন মোমোর অর্ডার দিলেন। দোকানদার মহিলার হাতে একটি প্লেটে ৫টি চিকেন মোমো, এক বাটি স্যুপ দিলেন। দোকানের পাশের বেঞ্চে ছ' বছরের ছোট্ট ছেলে আর মা, দুজনেই বসেছে। মহিলা দোকানদারের থেকে একটা চামচ চেয়ে নিয়ে প্লেটের মোমোগুলো তিনটি ভাগে ভাগ করে নিলেন। দুটি মোমো ছেলের দিকে, দুটি নিজের দিকে। আরেকটি মোমো প্লেটের অন্যদিকে রাখলেন। ছেলে তো পরম আনন্দে মোমো খাচ্ছে। এমনিতেই এই পেন্ডামিকের বাজারে বাচ্চারা বাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার মধ্যেই মায়ের হাত ধরে একটু ঘুরতে যাওয়া অবশ্যই শিশুমনে অক্সিজেনের কাজ করে। বাচ্চাটি বেশ তাড়াতাড়ি নিজের ভাগের দুটি মোমো শেষ করল। চামচ দিয়ে তৃতীয় মোমোটা টেনে নিতে গেল, মা বারণ করলেন। ওদের পাশে পুরো ঘটনাটাই দেখছি আমি। মোমোর দোকানের আর সব খরিদ্দাররাও ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন। সবাই মহিলার এই আচরণে বেশ বিস্মিত, আমি মনে মনে ভাবলাম, বাব্বা মা হয়ে মহিলাটি এরকম অদ্ভুত আচরণ করলেন কেন? ওই তৃতীয় মোমোটা বাচ্চাটা নেবে এটাই তো স্বাভাবিক। ছোটো থেকে আমরা এটা দেখতেই অভ্যস্ত, মা সারাদিন ভালোমন্দ রান্না করে ভালো মাছের পিসটা বা ভালো কোনো রান্নার বেশিরভাগটাই বাড়ির সবাইকে দিয়ে বেঁচে থাকা অংশটা খেয়েই পরিতৃপ্তি পান। এটাই তো চেনা ছবি। তবে? বাচ্চাটি এবার কান্না জুড়েছে ওই তৃতীয় মোমোটা ওর চাই। অন্যান্য খরিদ্দার এবার কানাঘুষো শুরু করলো। মা নাকি রাক্ষুসী! ওইটুকু বাচ্চা খাবারটা চাইছে কিন্তু না, সেই একভাবে বাচ্চাটাকে বারণ করে যাচ্ছে। কাঁদিয়েই দিলো বাচ্চাটাকে। কেউ আবার বলছে, দেখে তো মনে হচ্ছে অবস্থাপন্ন ঘরের মহিলা, আরেক প্লেট মোমো নিজের জন্য কিনতে পারছে না! আসলে আজকালকার মেয়ে তো, এরা কী বুঝবে মায়ের কর্তব্য। দোকানদার মহিলাকে বলল, দিদি আরেক প্লেট মোমো দেব? মহিলা বলল, না ভাই। আমি সবটাই পাশে বসে লক্ষ্য করছি। চারিদিকের এতো কথা মহিলার কানে যেন ঢুকছেই না। হঠাৎ দেখলাম, কাটা চামচ দিয়ে মহিলা ওই তৃতীয় মোমোটা অর্ধেক করলেন। অর্ধেকটা দিলেন ছেলেকে অর্ধেকটা নিজের জন্য রাখলেন।

বাচ্চাটি কান্না থামিয়ে অর্ধেকটা মোমো খুব আনন্দে খেল। খাওয়া শেষ হলে প্লেট নামিয়ে মহিলা ব্যাগ থেকে টাকা বার করে দোকানদারকে দিয়ে বললেন, আরেক প্লেট মোমো আমি নিতেই পারতাম, কিন্তু কী জানো ভাই, ছেলেকে এটা বোঝানোর খুব দরকার ছিল যে বাবা-মায়ের সঙ্গে সমান ভাবে ভাগ করে খেতে হয়। নইলে ভবিষ্যতে ও একজন স্বার্থপর মানুষ তৈরি হবে। তখন ওকে দোষ দিয়ে লাভ কী বলো? আরও একটা ব্যাপার কী জানো ভাই, মা-ই শুধু বাচ্চার খেয়াল রাখবে এই ভাবনাটা ঠিক নয়। বাচ্চাকেও শেখাতে হবে মায়ের খেয়াল রাখতে। তবেই দেখবে আগামীদিনে বৃদ্ধাশ্রমের ভিড় কমবে। ছেলের হাত ধরে মহিলা রাস্তার ফুটপাত ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। আমি দেখছি ধীরে ধীরে ব্রিজের দিকে মিলিয়ে গেল ওরা।

অনেক বড়ো একটা শিক্ষা দিয়ে গেল সো কলড 'আজকালকার মা'। সত্যি তো, এই বিষয়টা কখনো ভেবেই দেখিনি আমরা। মায়ের প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত সন্তানকে উপযুক্ত করে তোলা। যাতে সে বড়ো হয়ে বাবা-মায়ের খেয়াল রাখে, ভালোবাসে। যাতে কোনও বাবা-মা-কেই আর কখনও বৃদ্ধাশ্রমে যেতে না হয়।

ভ্রমণজনিত অসুস্থতা কাটাবেন কীভাবে

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

বাস বা ট্রেনের ঝাঁকুনি, বিমানের উচ্চতার কারণেই মূলত মোশন সিকনেসের সমস্যায় পড়েন অনেকে। এতে পেটে অস্বস্তিকর অনুভূতি, মাথা ভাব, মাথা ঘোরা বা মাথা ধরার মতো সমস্যা। অনেক মানুষই এই ধরনের সমস্যায় ভোগেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক এইসব সমস্যা থেকে মুক্তির কিছু সহজ উপায়।

ঘোরা, কানে ভোঁ ভোঁ ইত্যাদি সমস্যা দেখা যায়। বিশেষ করে বাস, প্রাইভেট কার বা ইঞ্জিনচালিত যানবাহনগুলিতে বমির সমস্যা হতে পারে। দীর্ঘ বা ছোটো যে কোনও ভ্রমণই আপনার শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে বমি হওয়ার প্রবণতা থাকলে।

আমাদের অন্তঃকর্ণ শরীরের গতি ও জড়তার ভারসাম্য রক্ষা করে। যখন গাড়িতে করে আমরা কোথাও যাই তখন অন্তঃকর্ণ মস্তিষ্কে খবর পাঠায় যে সে গতিশীল। কিন্তু চোখ বলে অন্য কথা। কারণ তার সামনের বা পাশের মানুষগুলো কিংবা গাড়ির সিটগুলো স্থির থাকে। চোখ ও অন্তঃকর্ণের এই সমন্বয়-হীনতার ফলে তৈরি হয় মোশন সিকনেস বা ভ্রমণজনিত অসুস্থতা। এই কারণেই তৈরি হয় বমি বমি

যানবাহনে বমি থেকে রক্ষা পেতে জানালার কাছে বসার চেষ্টা করুন। জানালা খুলে দিন। খোলা বাতাসে মন প্রাণ চনমনে থাকবে। গাড়ি যেদিকে চলছে সেদিকে পেছন দিয়ে বসবেন না বা পেছনের সিটেও যতটা সম্ভব না বসার চেষ্টা করুন। ভ্রমণের সময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলে এই সমস্যা কিছুটা কম হয়। খোলা জানালা দিয়ে লম্বা লম্বা শ্বাস নিতে পারেন। বমিভাব দূর করতে সবচেয়ে কার্যকরী ভেষজ আদা। আদা কুচি করে মুখে দিয়ে রাখুন, বমিভাব দূর হবে। অথবা মুখে এক টুকরো লবঙ্গ রেখে দিন। তাও বমি ভাব দূর করতে দারুন কার্যকর। পুদিনা পাতায় গ্যাসট্রিক জনিত বমিভাবও দূর হয়। ভারী খাবারের পর দারুচিনি খেলে হজমে সাহায্য করে। তাই হজমের সমস্যাজনিত কারণে বমি বমি ভাব লাগলে দারুচিনি খান। টক জাতীয় খাবার খেলেও বমি ভাব দূর হয়। লেবুর রসে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড বমিভাব দূর করে। তবে গ্যাসট্রিকজনিত কারণে বমিভাব হলে লেবু না খাওয়াই ভালো। লেবু পাতা শুঁকলেও বমি বমি ভাব দূর হয়। এছাড়া যাদের বাসে বা ট্রেনে গেলে সমস্যা হয় তারা গাড়িতে ওঠার আগে বমির ওষুধ খেয়ে উঠতে পারেন। সুপারি বা চুইংগামও মুখে রাখতে পারেন।

সবথেকে বড়ো কথা যানবাহনে ওঠার আগে কী খাওয়া উচিত আর কী খাওয়া উচিত নয় সেদিকে নজর দিন। যাত্রা শুরুর একটু আগে ভরপেট খাবেন না। অতিরিক্ত সফট ড্রিংকস বা ঝাল মশলা যুক্ত খাবার খাবেন না। দূরের পথ হলে হালকা শুকনো কিছু খাবার খেতে পারেন। অতিরিক্ত ঘ্রাণ বা সুগন্ধযুক্ত খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। যাওয়ার সময় প্রকৃতি দেখুন। নীচে বা ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকলে মাথা ঘোরা বা বমি ভাব বেশি হয়। এছাড়া যাদের এই ধরনের সমস্যা রয়েছে তারা যানবাহনে উঠে বই বা কাগজ পড়া, মোবাইল বা ল্যাপটপ ব্যবহার থেকে নিজেদের বিরত থাকুন।

চলার পথে সহযাত্রীদের বমি করতে দেখলে বমির সমস্যা প্রবল হতে পারে। তাই বাইরের দিকে মনোযোগ দিন। সব থেকে ভালো ঘুমিয়ে পড়ুন। নিজেকে অনেক বেশি ফ্রেস লাগবে তাতে। তবে যদি খুব অল্প দূরত্বে বা ঘনঘন এই সমস্যা হয় তাহলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করাটাই শ্রেয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় খুব সহজেই এই উপসর্গ সেরে যায়। □

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কী প্রভাব পড়তে চলেছে ভারতে? জানালেন কর্নেল সব্যসাচী বাগচী। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন অনামিকা দে।

প্রমাণ হলো ভারত এখন অপ্রতিরোধ্য : কর্নেল সব্যসাচী বাগচী

প্রশ্ন : রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে ভারত তথা সারা বিশ্বে কী প্রভাব পড়বে বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর : বিপুল তেলের ভাণ্ডার রয়েছে রাশিয়াতে। রাশিয়ার তেল ও গ্যাস আমরা নিয়ে থাকি। রাশিয়ার কাছ থেকে আমরা তেল কিনি রুবেলে। এই কুড়ি বাইশ দিনের লড়াইতে টাকা ও রুবেলের ডাউনফল হয়েছে। রাশিয়া আমাদের অপরিশোধিত তেল দিতেও চাইছে। রাশিয়ার তেলের স্যাংসানে আমাদের অসুবিধে হবে না, কারণ এর আগে আমরা দেখেছি রাশিয়ার অস্ত্র কেনার ব্যাপারে আমেরিকার স্যাংশানে আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। আমাদের প্রায় আশি শতাংশ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম যেমন ট্যাংক, মিসাইল, এয়ারক্রাফ্ট— এই সমস্ত কিছুই রাশিয়া থেকে আসে। পশ্চিমি শক্তি জানে রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক আছে। যুদ্ধ আমাদের খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। আমাদের প্রায় ছয়শো পঁয়তাল্লিশ বিলিয়ন ডলার ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ আছে যেটা আমাদের কুশানের মতো কাজ করবে। দ্বিতীয়ত, আমরা এই মুহূর্তে রিনিউয়েবেল এনার্জি রিসোর্সে নিজেদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছি। সারা পৃথিবীতে যে ক্লাইমেট কেন্দ্রিক ভাবনাচিন্তা বা ভয় সেটা আমাদের নেই, কারণ আমরা সোলার এনার্জিকে কাজে লাগাচ্ছি এরপর লিথিয়াম বেসড ভেহিকেল সিস্টেম এসে যাবে, সুতরাং পেট্রোপণ্য সংক্রান্ত সমস্যায় আমাদের পড়তে হবে না। আমাদের ভয়ের কারণটা ইকোনমিক দিক থেকে নয়, অন্য জায়গায়। রাশিয়ার পুতিন যেটা বলছে অ্যাকচুয়াল নিউক্লিয়ার উইপেন ওয়ারের কথা সেটা অবশ্যই এক ভয়ংকর দিক। কারণ অ্যাটমিক ওয়েপেন অ্যাটাক কোনো ভৌগোলিক সীমানা মানে না। রাশিয়া যদি ইউক্রেনের ওপর এই অ্যাটাক করে তবে রাশিয়া নিজেও এর থেকে বাঁচবে না।

প্রশ্ন : যুদ্ধে বিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে যেখানে অন্যান্য দেশগুলি তাদের নাগরিকদের সুরক্ষিতভাবে দেশে ফেরাতে পারছে না সেখানে ভারত প্রায় ২৩,০০০ পড়ুয়াকে সুরক্ষিতভাবে দেশে ফেরাতে সক্ষম হয়েছে। এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি কী?

উত্তর : ইউক্রেনের সঙ্গে আমাদের সেভাবে কোনো সুসম্পর্ক নেই। বরঞ্চ ইউক্রেন আমাদের বিরোধিতাই করেছে বরাবর। কিন্তু ভারতের প্রায় তেইশ হাজার ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী ইউক্রেনে ডাক্তারি পড়তে গেছে। ভারতে ন্যাশনাল লেভেলে এলিজিবিলিটি টেস্টে যারা র‍্যাংকিং পায় তারা ওখানে ডাক্তারি পড়তে পারে। ইউক্রেন রাশিয়ায় এই কম্পিটিশনটা কম। তাই সেখানে পড়তে যাওয়া। যদিও এই যুদ্ধ শুরুর আগেই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো স্টুডেন্টসদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে কিন্তু ভারতীয়রা মিডিল অব সেশনে আসতে চায়নি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের কোনো তুলনা হয় না। এর আগেও আফগানিস্তান থেকে অপারেশন দেবীশক্তির মাধ্যমে আটকে থাকা ভারতীয়দের আমরা উদ্ধার করেছি। করোনার সময় আমরা চীনের থেকে প্রায় বিশ হাজার ভারতীয়কে উদ্ধার করে এনেছি। চীনের উহানে পড়তে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের আমরা নিয়ে এসেছি অপারেশন বন্দে ভারতের মাধ্যমে। এবার অপারেশন গঙ্গার মাধ্যমে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ধার করা হলো। গর্বে বুক ফুলে ওঠে যখন দেখি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কথায় রাশিয়া ছ' ঘণ্টা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ধার করা হয়। অর্থাৎ বিশ্বের কাছে এটা প্রমাণিত হলো ভারত আজ বিশ্ব দরবারে একটি অপ্রতিরোধ শক্তি।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটানোই হবে ভারতের আশু কর্তব্য

সুজিত রায়

রাশিয়া ও ইউক্রেন— দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই, সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন একটা প্রশ্ন বড়ো হয়ে উঠেছে— আবারও কি একটা বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে? ঠিক তেমনি বিদগ্ধ মহলে একটা প্রশ্নের জবাব খোঁজাও শুরু হয়েছে— ভারতের শেষ পদক্ষেপ কী হবে?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, এমনকী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন হয়েছিল তখন ভারতের ভূমিকা নিয়ে কারোরই তেমন মাথাব্যথা ছিল না— না ভারতবাসীর, না বিশ্ববাসীর। কারণ ভারত তখনও পরাধীন দেশ— ব্রিটিশ উপনিবেশ। সার্বভৌমত্ব না থাকার কারণে ভারতের যা কিছু করণীয় সেটা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাজনীতি সচেতন ভারতবাসীর ভূমিকা ছিল— যুদ্ধের আবহকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া। সেখানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে খুব বেশি চিন্তাভাবনার সুযোগ ছিল না।

কিন্তু স্বাধীনতা-প্রাপ্তি যখন প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেল এবং ঠিক হয়ে গেল— খণ্ডিত স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবেন সমাজবাদী নেতা জওহরলাল নেহরু তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ভারত কখনও পুঁজিবাদী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক হবে না। তার ভূমিকা হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধা, কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক দেশ তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন।

ফলত, রাষ্ট্রনির্মাণের প্রাথমিক ধাপ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের প্রাথমিক পর্ব থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমন অকাতরে ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বন্ধুর মতো, তেমনই দূরত্ব তৈরি হয়েছে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে। আন্তর্জাতিক সমস্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রেই ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন হাত মিলিয়ে কাটিয়েছে দীর্ঘকাল। এমনকী ১৯৯১ সালে যখন চূড়ান্তভাবে স্থির হয়ে গেল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব আর নেই এবং সরকারিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৫টি স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক দেশে টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং মুছে গেল দ্বিতীয় বিশ্বের অস্তিত্ব, তখনও ভারত নতুনভাবে গঠিত 'রাশিয়া'র সঙ্গে বন্ধুত্বের ছেদ ঘটায়নি। কারণ রাশিয়া সেদিনও রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় সমাজতন্ত্রকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। ফলে রাশিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাতে ভোলেনি।

কিন্তু চলতি হাওয়ায় ভারতের ভূমিকা ঠিক কী হবে, ঠিক কী হওয়া উচিত সেটা বিশ্বরাজনীতির বর্তমান পটভূমিকায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সালের পর থেকেই মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে চলেছে এবং সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর মধ্যে গড়ে ওঠা মধুর সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আলোড়ন উঠেছে বিশ্বরাজনীতিতে। প্রশ্ন উঠেছে যে ভারত কী বিশ্বায়নের অর্থনীতির সঙ্গে সঠিক মাত্রায় গাঁটছড়া বাঁধতে পুঁজিপতি রাজনীতিরই শরিক হবে, নাকি এটি একটি বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ? কারণ চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সদ্য গড়ে ওঠা রাশিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পালটা প্রাচীর গড়ে তোলাটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যদিও নতুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের আমলে ভারতকে আবার নতুন করে ভাবতে হয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব রাজনীতিকে ছেড়ে ঠিক কতখানি এগোবে ভারত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দিকে।

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ ও আগ্রাসনের ভূমিকায় ভারত কী করবে তা নিয়েই তুঙ্গে উঠেছে বিদগ্ধ মহলের বিতর্ক। এখনও পর্যন্ত ভারতের ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে ভারসাম্যমূলক। অর্থাৎ তুলাদণ্ডের মাপে দু'পক্ষের প্রতি ভারসাম্যমূলক মনোভাব বজায় রেখেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কোনদিকে গড়ায় তার ওপর লক্ষ্য রেখে পথ হাঁটছে ভারত। গত ২ মার্চ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ১৪১টি

দেশ রাশিয়ার আক্রমণকে চরমভাবে সমালোচনা ও নিন্দা করলেও ভারত ছিল নিরুত্তর। বিশ্বের আরও ৩৪টি দেশের মতোই ভারতও এ বিষয়ে ভোটাভুটি থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঠিক যেমন ভাবে ঠিক আগের দিন ১ মার্চ রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবেও ভোট দেয়নি ভারত। ভারতের এই পদক্ষেপ অবিশ্বাস্য বা বিস্ময়কর নয় মোটেই, কারণ ভারত-রাশিয়ার বন্ধুত্ব ঐতিহাসিকভাবেই স্বীকৃত এবং ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত এখনও অনেকটাই রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল। দেশের সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতেও জাপানের মতো রাশিয়ার অগ্রণী সাহায্যকারীর ভূমিকাকে ভারতবর্ষ অস্বীকার করতে পারে না। ভারত এও জানে— এই মুহূর্তে ইউরোপের দিকে সমর্থন জোগানো মানে রাশিয়া ও চীনের সম্পর্ককে আরও মজবুত করে তোলা এবং সেই সঙ্গে পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী ভাবমূর্তিকে চাঙ্গা করে তোলা। ফলত, ভারসাম্য বজায় রাখাই শ্রেয়। 'বন্ধুর শত্রু আমার বন্ধু' এই নীতি থেকে আপাতত দূরে থাকা।

তবে একথা ঠিক ভারতবর্ষ কখনই খোলাখুলি রাশিয়ার যুদ্ধনীতিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করে বিবৃতি দেয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বরং ভারসাম্যের রাজনীতিকে বজায় রাখতেই বারবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে অনুরোধ জানিয়েছেন— যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথে হাঁটতে। কিন্তু কখনই রাশিয়াকে যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য দায়ী করে একটা লাইনও উচ্চারণ করেননি। ভারতের এই ভূমিকাকে রাশিয়া স্বাগত জানিয়েছে। যদিও ইউক্রেন ক্রমাগত চেয়ে এসেছে, ভারত সরকার রাশিয়ার যুদ্ধনীতির বিরোধিতা করুক। কিন্তু খুব দীর্ঘদিন যুদ্ধপরিস্থিতি জারি থাকলে ভারতবর্ষ এই মনোভাব পোষণ করে চলতে পারবে না। একটা সময়ে তাকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হবে, কারণ গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ রাশিয়ার যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে চুপ করে থাকবে, নিরীহ মানুষ যুদ্ধের শিকার হবে, একটি স্বাধীন দেশ সার্বভৌমত্ব হারাবে, গোটা বিশ্ববাসী ভারতের এই ভূমিকাকে স্বাগত জানাবে না। মানবাধিকারের স্বার্থে ভারতকে নিজস্ব ভাবমূর্তি ধরে রাখার জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। কী হতে পারে সেই পদক্ষেপ?

একটু ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরানো যাক। অতীতে দেখা গেছে, ভারত এরকম আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এক এক সময় এক একরকম ভূমিকা পালন করেছে। এবং সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ও স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির অনুগামী হয়েই। বিংশ শতাব্দীতে

যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধ থামানো এবং সমাধান সূত্র খোঁজার আলোচনায় নেতৃত্ব দিতে হবে ভারতকে। সেটা সম্ভব হলে ভারতের ঐতিহ্যবাহী ভাবমূর্তি যেমন বজায় থাকবে তেমনি সুরক্ষিত থাকবে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যেমন তীব্র সমালোচনা করেছে ভারত, তেমনি ১৯৫৬ সালের 'সুয়েজ সংকট' ইস্যুতে ব্রিটিশ, ফরাসি ও ইজরায়েলের ভূমিকার বিরোধিতা করেছে। আবার একই সময়ে হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত আক্রমণের কোনো বিরোধিতাই করেনি ভারতবর্ষ।

এর কারণ কী?

কারণ একটাই— ভারতের নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করতে চীন ও পাকিস্তানের আঁতাতের রাজনীতিকে রাশিয়ার রক্তচক্ষু দেখিয়ে ভয় দেখানো। কারণ রাশিয়ার পূর্ণ সমর্থন পেলেই পাকিস্তান ঝাঁপিয়ে পড়বে কাশ্মীর দখল করতে। চীন ষোলোআনা সমর্থন জোগাবে, কারণ ভারতবর্ষের বাজার দখল তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন।

কিন্তু আজকের দিনে বিশ্ব অর্থনীতির চেহারাটাই যখন বদলে গেছে, তখন ভারতের এই ভারসাম্য নীতি দীর্ঘদিন জিইয়ে রাখা যাবে না। একদিকে মার্কিনি বন্ধুত্ব, অন্যদিকে রাশিয়ার ঐতিহাসিক ভারতবন্ধুর ভূমিকা— কোনোটাকেই ভারত এড়িয়ে থাকতে পারবে না। ফলে কড়া সিদ্ধান্ত নিতেই হবে আজ আথবা কাল। অবশ্য সবটাই নির্ভর করছে যুদ্ধ পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নেয় তার ওপর।

ভারতের কাছে চাপ দুদিক দিয়েই। একদিকে দুই প্রধান শক্তিধরের কোনো একজনের শত্রু হতে হবে, অন্যদিকে সামাল দিতে হবে যুদ্ধপরবর্তী তীব্র মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত আজও রাশিয়ায় ওপরই বেশি নির্ভরশীল কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও এড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। ফ্রান্স বা ব্রিটেনের মতো দেশগুলির সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ সমর্থন দিতে পারবে না। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো— কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের অর্থনীতি কোন খাতে গড়াতে চলেছে তা যখন অনিশ্চিত, ঠিক তেমন সময়েই মাথার ওপর খাঁড়ার মতো ঝুলছে পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসের দাম উত্তুঙ্গ হওয়ার। যুদ্ধ যত তীব্র হবে, সংকটও তত তীব্র হবে।

সুতরাং এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের চেষ্টা হবে যাতে যুদ্ধ পৌঁছয় সন্ধির টেবিলে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে ভারতকে বলতে হবে— বিশ্বায়নের বিশ্বে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বে হাত দেওয়া অন্যায়। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বিরুদ্ধে চীনের সম্ভাব্য আগ্রাসন ভূমিকায় বিশ্ব রাজনীতির সমর্থন পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। মার্কিন প্রশাসন জানে, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের সম্মিলিত ভাবে সৃষ্ট ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজিকে ভারতবর্ষ সরাসরি সমর্থন করতে পারবে না রাশিয়ার বন্ধুত্বকে বিপন্নতার পথে ঠেলে দিয়ে। সেটা হবে আত্মহত্যার শামিল। কারণ যুদ্ধের পর রাশিয়া-চীন আঁতাত আরও দৃঢ় হবে এবং এখন ভারত বিরোধিত করলে কাশ্মীর প্রসঙ্গেও রাশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এ সমস্যা শুধু ভারতেরই নয়। গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব দেশই এই দ্বিধায় ভুগছে। গুরুত্বপূর্ণ টেকনোলজি সরবরাহ থেকে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ, সামাজিক প্রকল্পে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যদান, বৈদেশিক সম্পর্ক— সব ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মতো দেশগুলি এখনও অনেকটাই রাশিয়া-নির্ভর।

বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে, ভারতবর্ষকে এখন এমন একটি নীতি মেনে চলতেই হবে— যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি পদক্ষেপ হবে— যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধ থামানো এবং সমাধান সূত্র খোঁজার আলোচনায় নেতৃত্ব দেওয়া। সেটা সম্ভব হলে ভারতের ঐতিহ্যবাহী ভাবমূর্তি যেমন বজায় থাকবে তেমনি সুরক্ষিত থাকবে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা। এছাড়া 'নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়ঃ।'

মোদীর বিদেশ ভ্রমণেই পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য

নিখিল চিত্রকর

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২৪৯ জন ভারতীয়দের নিয়ে বিশেষ বিমান যখন নয়া দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মাটি ছুঁলো, রাত তখন ২ বেজে ৫৫ মিনিট। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে স্বজনদের ফিরতে দেখে পরিবারের সদস্যরা কেউ হাসছেন, কেউ কাঁদছেন। কেউ-বা জড়িয়ে ধরেছেন পরস্পরকে। সেই মুহূর্তের ছবি ধরা থাকলো প্রতিটি দৈনিকের প্রথম পাতায়, আর টিভি চ্যানেলের ব্রেকিংয়ে। সেদিন নরেন্দ্র মোদীর ঘোর সমালোচকও ছাপান্ন ইঞ্চির ছাতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর সেই সব পড়ুয়ারা, যারা সুদূর ইউক্রেনের রুদ্ধশ্বাস যুদ্ধ পরিস্থিতি পাশ কাটিয়ে দেশে ফিরলেন, তাদের ঠোঁটের চওড়া হাসিই জানান দিচ্ছিল 'মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'।

এই তো সেদিনের কথা। যখন সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ ভ্রমণ নিয়ে আঙুল তুলেছিলেন। তাদের কৌতূহল ছিল এটা জানার যে নরেন্দ্র মোদী বিদেশে গিয়ে কী করেন? এবং এই বিদেশ ভ্রমণের ফলে 'আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ায়' ভারতের লাভ কতখানি?

এর মোক্ষম জবাবটা এলো চলতি বছরের রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পটভূমিতে। জবাবটা দেওয়ার জন্য যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে একটিও বাক্যব্যয় করতে হয়নি। বরং তাঁর কাজ, তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতাই বিরোধীদের সবকিছু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

এই প্রতিবেদনটি যখন প্রকাশিত হবে ততদিনে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে আটকে থাকা প্রায় তেইশ হাজার ভারতীয়কে নিরাপদে ভারতে উড়িয়ে আনার অভিযান 'অপারেশন গঙ্গা' শেষ করে ফেলবে, ভারতের বিদেশ মন্ত্রক ও ভারতীয় বিমান বাহিনী। রুশ আক্রমণে ছারখার হয়ে যাওয়া ইউক্রেনের সবচেয়ে অগ্নিগর্ভ 'সুমিতে আটকে পড়া শেষ ৭০০ জন ভারতীয়কেও ফিরিয়ে আনতে সফল হবে 'সবকা সাথ, সব কা বিশ্বাস'-এর সরকার।

ইউক্রেনের স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, ভারতীয় পড়ুয়াদের এবং প্রবাসীদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাশিয়া ও ইউক্রেন— দুই যুযুধান পক্ষের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করাটাই ছিল ভারত সরকারের কাছে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। এবং সবচেয়ে কঠিনও। এই ক্ষেত্রে রাশিয়া ও ইউক্রেনের দুই রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে নিরন্তর ফোনে কথা বলে গেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। দুই দেশের সম্পর্কের স্থিতিশীলতা এবং স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি, ভারতীয়দের নিরাপদে ঘরে ফেরানোর তাগিদও দেখিয়েছেন তিনি। ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত দফায় দফায় পুতিন এবং জেলেনোস্কির সঙ্গে কথা বলেছেন নরেন্দ্র মোদী, যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন। আর সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন। ভারতের চিরন্তন সাংস্কৃতিক আদর্শে বড়ো হওয়া নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রাচীন ধারাটিকে আজও বহন করে চলেছেন রীতিনীতি মেনে। তা হলো প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য পালনের রীতি। তিনি নরেন্দ্র মোদী। তিনি রাজধর্ম পালনে অবিচল। তিনি মানবহিতৈষী। কার্যত তাঁর নির্দেশেই ভারতের বিদেশমন্ত্রী এবং বিদেশ সচিব, রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে দৌত্যের কাজ চালিয়ে গেছেন। পাশাপাশি ইউক্রেনের ভারতীয় দূতাবাসকে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে দেখা গেছে। সাউথ ব্লকের লাগাতার প্রচেষ্টার ফলেই কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের রাস্তায় ভারতীয় পড়ুয়া ভর্তি বাসগুলোয় ভারতের জাতীয় পতাকা দেখলেই 'সেফ করিডর' করে দিয়েছিল রুশ ও ইউক্রেনীয় সেনারা। আমরা যখন টিভি চ্যানেলে অথবা দৈনিকগুলোতে যুদ্ধের ভয়াবহ ছবি দেখে শিউরে উঠছি; তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় দিন গুনছি, রুশ বোমারু বিমান আকাশ থেকে নিখুঁত লক্ষ্যভেদে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইউক্রেনের একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডমার্ক— তখন বিদেশমন্ত্রী এস

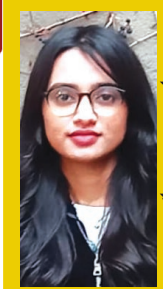

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অসংখ্য ধন্যবাদ

নাজিয়া রহমান

ইউক্রেন থেকে ফিরে আসা ছাত্রী

'আমি কিভ মেডিকেল ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। খুব সংকটজনক পরিস্থিতিতে ভারতীয় দূতাবাস কিভ থেকে আমাদের উদ্ধার করেছে। হাঙ্গেরি সীমান্তে পৌঁছানো পর্যন্ত তারা আমাদের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রেখেছিল। হাঙ্গেরিতে পৌঁছে সেখানকার ভারতীয় দূতাবাস আমাদের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে, ভারতে ফেরার বিমানের ব্যবস্থা করে দেয়। কিভে মাত্র এক বোতল জলে দুদিন কাটাতে হয়েছে। খাবার ছিল না। কীভাবে প্রাণে বাঁচবো, তা নিয়েই উৎকণ্ঠায় ছিলাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও সার্বিকভাবে ভারত সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবে আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।'

জয়শঙ্কর যোগাযোগ রাখছেন ইউক্রেনীয় বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে। অন্যদিকে রাশিয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সরাসরি সেদেশের সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গেছেন। এই অভূতপূর্ব দৌত্যের পর, ইউক্রেন ভারতীয় ছাত্রদের সীমান্ত পর্যন্ত সামরিক পাহারা দিয়ে এগিয়ে দিয়েছে। রাশিয়াও প্রতিশ্রুতি দেয়, ভারতীয় কনভয়ের উপর যাতে কোনও হামলা না হয় তা তারা নিশ্চিত করবে।

বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য বলছে, ২০১৯ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চুরাশিটি বিদেশ সফর করেছেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি ছাড়াও আমেরিকা, ইউরোপ সফরে গেছেন। কোয়াড সম্মেলন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভা, জি-২০ এবং সিওপি-২৬ সম্মেলনে ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। রাশিয়া, ইতালি, ব্রিটেন, জাপানের মতো বহু দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর আমলে বিদেশ সফরের ফলে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি ভারতে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি, মেধা, মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যৌথ উদ্যোগে অনেক কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দৃঢ় হওয়ার সুবাদে আঞ্চলিক ও বিশ্বের বিভিন্ন ইস্যুতে ভারতের মনোভাবের বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা পৌঁছেছে অন্য দেশগুলির কাছে। ফলে ভারতের উন্নয়ন সংক্রান্ত ইস্যুর পাশাপাশি দেশের নাগরিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও পরিবর্তন এসেছে। এর আগে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল।

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের অনেক আগেই ভারত এই পরিস্থিতির আঁচ পেয়েছিল। যে কারণে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে দেশের প্রবাসী ও পড়ুয়াদের ইউক্রেন ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা বিষয়টাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। অবশেষে ৭৬টি বিমানে করে ঘরের ছেলে-মেয়েদের দেশে ফিরিয়ে এনেছেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সহযোগীরাও দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন। সেদিন যারা সংসদে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, মোদীর বিদেশ ভ্রমণে ভারতের কী লাভ? আজ তারা মুখ লুকিয়েছে। অথবা মুখে কুলুপ এঁটেছে। পরারাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি ছেলের হাতের মোয়া নয়। যারা চটজলদি ফলের আশা করেন, তারা পররাষ্ট্রনীতির গভীরতা বুঝতে অপারগ।

আজকের 'আত্মনির্ভর ভারত' বিশ্বমানচিত্রে স্বাধীন শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। এ ভারত কারো কাছে মাথা নত করবে না। বিশ্বের অন্যান্য তথাকথিত উন্নত দেশগুলোর ভিত যখন নড়বড় করছে, তখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি করে চলেছে ভারত। ইউক্রেন বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে চিরকাল ভারতের বিরোধিতা করে এসেছে। জঙ্গি কার্যকলাপ ইস্যুতে পাকিস্তানের বক্তব্যে সায় দিয়েছে। এমনকী ভারতকে ইউরেনিয়াম দিতেও অস্বীকার করেছে। সেই ইউক্রেন রাশিয়ার আক্রমণের মুখে পড়ে ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করছে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে যুদ্ধ থামাতে রাজনৈতিক সাহায্যের আর্জি জানাচ্ছেন। 'আচ্ছে দিনের' উদাহরণ এর থেকে ভালো আর কীই-বা হতে পারে। একদিকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল গ্রাস ঠেকাতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া অন্যদিকে ভারতীয় প্রবাসী ও পড়ুয়াদের উদ্ধারের জন্য 'অপারেশন গঙ্গা'র সফল অভিযান, বিশ্বগুরু হিসেবে ভারতের প্রতিষ্ঠা'র জানান দিচ্ছে। ☐

ফ: ৪

সরকার সাহায্য না করলে ফিরতে পারতাম না

শ্রীমা ঘরামি

ইউক্রেন থেকে ফিরে আসা ছাত্রী

'ভারত সরকার যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তা ভোলার নয়। আমাদের সঙ্গে চীন বাংলাদেশ পাকিস্তানের ছাত্র-ছাত্রীরাও ছিল। কিন্তু তারা তাদের দেশ থেকে কোনও সাহায্য পায়নি। খুবই খারাপ অবস্থায় আছে ওরা। অনেকে প্রশ্ন করছেন কেন ইউক্রেনে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলাম? এখানে সরকারি কলেজে সিট কম আর বেসরকারি কলেজে আকাশছোঁয়া ক্যাপিটেশন ফি। তুলনায় ইউক্রেনে পড়াশোনার খরচ এখানকার এক-চতুর্থাংশ। যার ফলে আমরা বাধ্য হয়ে ইউক্রেনে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলাম। তবে তখন কে আর জানত এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

বাড়লো শিল্প বৃদ্ধির হার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শিল্প মহলকে আশ্বস্ত করে বৃদ্ধির হার বজায় থাকলো দেশের শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে। অতিমারির তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্যে জানুয়ারিতে দেশে শিল্প বৃদ্ধির হার দাঁড়ালো ১.৩ শতাংশে। গত বছর এই সময়ে শিল্পোৎপাদন সরাসরি কমেছিল ০.৬ শতাংশ। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মূলত খনন ও কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির হাত ধরে শিল্পোৎপাদন মাথা তুলেছে। তা বেড়েছে যথাক্রমে ২.৮ শতাংশ ও ১.১ শতাংশ। উৎপাদন শিল্প ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ০.৯ শতাংশ এবং গত ডিসেম্বরে ০.১ শতাংশ কমেছিল। সেখানে এবারের এই বৃদ্ধি সন্তোষজনক বলেই জানাচ্ছে বিশেষজ্ঞ মহল।

বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধির অর্থনীতি হওয়ায় পথে এগোচ্ছে ভারত। শিল্পক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি তারই পূর্বাভাষ বলে দাবি করছে শিল্পমহল। তাদের আশা, আগামীদিনে উল্লেখযোগ্য হারে কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। বাজারের চাহিদা বাড়বে। এবং সেই সঙ্গে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

বিনামূল্যে বালিশ-কম্বলের সুবিধা পুনরায় চালু করল রেল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রেলযাত্রায় ফিরলো সুদিন। বিনামূল্যে কাগজের প্যাকেটে বালিশ-কম্বলের পরিষেবা আবার চালু করছে ভারতীয় রেল। সেই সঙ্গে বাতানুকূল বগির ভিতরে এবং জানালায় ঝুলবে পর্দাও। দূরযাত্রায় রেলভ্রমণে কম্বল, বালিশ, তোয়ালে, চাদর দেওয়ার চিরাচরিত নিয়ম ছিল ভারতীয় রেলের ব্যবস্থায়। কিন্তু দেশে করোনা সংক্রমণ শুরু হতেই ভারতীয় রেল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় বালিশ, কম্বল, চাদর, তোয়ালে দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল ২০২০ সালের ১১ মে থেকে। দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ ফিকে হতেই যাত্রীদের পুরনো পরিষেবা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে রেলমন্ত্রক।

তবে কোভিড আবহে শীতের সময় বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল রেলের তরফে। করোনা কালে ট্রেন সফরের সময় যাঁরা বালিশ, চাদর, কম্বল নিতে চান তাদের জন্য ওই সময় বিশেষ ব্যবস্থা চালু করা হয়। এর জন্য যাত্রীদের মাথা পিছু দিতে হচ্ছিল ৩০০ টাকা। তার বিনিময়ে রেল দিচ্ছিল একটি কম্বল, বিছানায় পাতার চাদর, বালিশ, বালিশের কভার, ইউজ অ্যান্ড থ্রো টুথ পেস্ট, ব্রাশ, মাথার তেল, চিরুনি, স্যানিটাইজার, পেপার সোপ এবং টিস্যু পেপার। এর চেয়ে সস্তায় ১৫০ টাকার একটি কিটও ছিল। প্রথমে দিল্লি থেকে শুরু হলেও পরে বড়ো স্টেশনগুলিতেও এই পরিষেবা বহাল করা হয়।

অবশেষে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসতেই যাত্রীদের বিনামূল্যে কম্বল-বালিশ দেওয়ার পরিষেবা আবার চালু করতে চলেছে ভারতীয় রেল। গত ১০ মার্চ দেশের সমস্ত রেলওয়ে জোনকে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে যাত্রীদের পুরনো পরিষেবা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারতের রেলমন্ত্রক।

গোপালী ইউথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শিশুদের হস্টেল উদ্‌ঘাটন

গোপালী ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (GYWS) হলো একটি নিবন্ধীকৃত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যা আইআইটি খড়্গপুরের ছাত্র ও অধ্যাপকদের পরিচালিত। এই সংস্থা আইআইটি ক্যাম্পাসের পাশে অবস্থিত গোপালী গ্রাম ও তার আশেপাশের মানুষদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য কাজ করে চলেছে। গত ৫ মার্চ এই সোসাইটি এলাকার হতদরিদ্র শিশুদের জন্য একটি হস্টেল উদ্‌ঘাটন করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক দেবেন রায় ও পরেশ মুর্মু, এসডিও ইমাজুল হোসেন, পিডব্লিউডি ও পরিবহণ কর্মাধ্যক্ষ নোবা কুমার দাস, গোপালী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুস্মিতা মুর্মু, অধ্যাপক ডি কে মাইতি, অধ্যাপক ভাস্কর ভৌমিক এবং সোসাইটির সমস্ত সদস্য। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইআইটির ছাত্রদের জিমখানার অধ্যাপক তথা সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কিংশুক ভট্টাচার্য। তাঁরা সকলেই শুভ উদ্‌ঘাটন উপলক্ষ্যে আয়োজিত পূজা ও গণেশ বন্দনায় অংশগ্রহণ করেন।

সোসাইটি তাদের পরিচালিত জাগৃতি বিদ্যামন্দিরে ২০০-র বেশি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য গুণসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করে চলেছে যা অবৈতনিক এবং বর্তমানে পঞ্চমশ্রেণী পর্যন্ত। এই শিশুরা বাড়িতে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে পড়াশোনায় মন দিতে পারে না। তাদের বড়ো হওয়ার পথে সঠিক পরামর্শদাতারও অভাব রয়েছে। সোসাইটি এই দিকগুলির কথা মাথায় রেখে তাদের হস্টেলে রেখে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছে। ২০২০ সালে হস্টেলের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল।

আইআইটি খড়্গপুরের প্রাক্তন ছাত্রদের সহায়তায় নির্মিত এই হস্টেলে এখন পর্যন্ত ৬০ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। শিশুদের জন্য রয়েছে পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা, খেলার মাঠ এবং তাদের দেখাশোনার জন্য পুরষ ও মহিলা ওয়ার্ডেন। রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা, ইভেন্ট পরিকল্পনা, বোর্ডারদের সামগ্রিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে পরিকাঠামো উন্নত করা এবং পরবর্তীকালে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা করার কাজ সোসাইটির হস্টেল কমিটি করে চলেছে। গঙ্গা জুট ইন্টারন্যাশনাল, পাবম্যাটিক ইন্ডিয়া, মিঃ দীপাঞ্জন দে, মিঃ গোপাল রাজঘড়িয়া, মিঃ খসরু পারভেজ খান, মার্চ টুগেদার, ম্যাথওয়ার্কস্ ইনকর্পোরেটেড এবং আর যাদের সহৃদয় সহায়তায় এই কাজ সম্ভব হয়েছে তাদের সকলের প্রতি গোপালী ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

এর সঙ্গে গোপালী ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি গোপালীর জনগণের চাহিদা পূরণ এবং শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী উন্নতির জন্য তাদের কর্মধারা অব্যাহত রেখেছে।

বিপ্লবী বিমল দাসগুপ্ত প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন

গত ৩ মার্চ মেদিনীপুর শহরের কলেজ রোডে বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের পূর্ণাবয়ব মূর্তির পাদদেশে বিমল দাশগুপ্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে বিপ্লবীর ২৩ তম প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। কমিটির সভাপতি জগবন্ধু অধিকারী-সহ প্রাণতোষ সরকার, অনিন্দিতা জানা, দীপক বসু প্রমুখ বিপ্লবীর প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান করেন। উল্লেখ্য, বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন জেলা শাসক পেডিকে হত্যা করেন। ১৯৪৬-এ কারাজীবন থেকে মুক্তি পেয়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করেন। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা-সহ শহরে বসবাস করতেন। মেদিনীপুর কলেজের পাশে একটি মিষ্টির দোকান করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। নিজের বা ছেলে-মেয়েদের জন্য কোনোরূপ সরকারি সাহায্য গ্রহণ করেননি। রাজনীতিও করেননি। তাঁর জীবনাদর্শ আজকের প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন বক্তারা।

করিমগঞ্জ সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের রজতজয়ন্তী তোরণ উদ্‌ঘাটন

'মাতৃভাষায় শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সেই চিন্তা নিয়ে দেশের প্রতিটি ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক বাধ্যতামূলকভাবে রাখতে হবে। আমি অসমীয়া ভাষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে চিকিৎসা বিভাগে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়েছি। আমি নিজের ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষায়

অনেক সাহিত্য অধ্যয়ন করেছি, তাই বাংলাভাষায় আপনাদের সঙ্গে নিজের মনের কথা তুলে ধরছি।' অসমের করিমগঞ্জ সরস্বতী বিদ্যা নিকেতনের রজতজয়ন্তী তোরণের উদ্‌ঘাটন করে এভাবেই বক্তব্য শুরু করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন, নতুন শিক্ষানীতি ২০২০-র মূল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানসমৃদ্ধ একটি উজ্জীবিত সমাজ গড়ে তোলা। গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতিতে একটি ছাত্রকে স্বাধীনতাযুদ্ধ, সিপাহি মহাযুদ্ধের ইতিহাস কিংবা কয়েকটি অঙ্ক শেখানোর মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। ব্রিটিশরা তাদের প্রয়োজনে শুধু সার্ভেন্ট তৈরি করার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকুই চালু করেছিল। কিন্তু সার্বিকভাবে সুসংহত ও জ্ঞানসমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা তারা গড়ে তোলেনি। স্বাধীনতার পর দেশে শিক্ষানীতি পরিবর্তনের জন্য অনেক সংশোধন আনা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে ওগুলো বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ফলদায়ী হয়নি।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিকল্প নেই বলে তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, বর্তমান সময়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের স্কুলগুলোকে পেছনে ফেলে দিয়ে সমাজের বিত্তশালীরা নিজেদের ছেলে-মেয়েকে দূরের কোথাও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু মাতৃভাষা মাধ্যমের স্কুলগুলোও যে গুণসম্পন্ন শিক্ষা দিতে সক্ষম তার উদাহরণ হচ্ছে সরস্বতী বিদ্যা নিকেতন। ব্রহ্মপুত্র এলাকায় বিদ্যা ভারতীর পরিচালনায় প্রায় পাঁচশোটি শঙ্করদেব শিশুনিকেতন রয়েছে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এক-একটি উন্নত মানের প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি সমাজের সচেতন নাগরিকদের বৃহত্তর স্বার্থে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।। বলেন, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারি প্রতিষ্ঠান না ভেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান মনে করে নিয়মিত খোঁজখবর নিতে হবে। সরকারি বরাদ্দকৃত সুযোগসুবিধা সঠিকভাবে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছায় তার খবর সমাজের সচেতন নাগরিকদের নিতে হবে কিংবা মূল্যায়ন করতে হবে। সমাজের সার্বিক স্বার্থে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব না হলে কেউ শান্তিতে থাকতে পারবেন না।।

এদিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি ডাঃ কমলেশ দে। সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাহ তাঁর বক্তব্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আগামী অর্থ বছরে করিমগঞ্জ সরস্বতী বিদ্যা নিকেতনের জন্য বিশেষভাবে অর্থ মঞ্জুর করা হবে বলে ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, বিধায়ক কৌশিক রাই, এএসটিসি-র চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, বিদ্যা নিকেতনের সভাপতি সুহাস রঞ্জন দাস, বিদ্যা ভারতীর সাংগঠনিক মন্ত্রী যোগেন্দ্র শিশোদিয়া, জেলা স্কুল সমূহের পরিদর্শক অনুপ কুমার দাস প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যা নিকেতনের প্রধান আচার্য অঞ্জন গোস্বামী। ধন্যবাদ জানান ডাঃ কমলেশ দে।

উত্তর মালদা সেবা ভারতী ট্রাস্টের উদ্যোগে অর্শ চিকিৎসা শিবির

উত্তর মালদা সেবা ভারতী ট্রাস্টের উদ্যোগে চাঁচল নগরে প্রতিবারের মতো এবারও গত ৬ মার্চ চাঁচল বাজার মাড়োয়ারি ধর্মশালায় অর্শ চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। গত চার বছর থেকে এরকম শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। করোনা মহামারীর কারণে গত দু'বছর এই সেবাকাজ বন্ধ ছিল। এলাকার কয়েক হাজার মানুষ এই সেবাকাজের ফলে উপকৃত হয়েছেন। এবারের শিবিরে পঁচাত্তর জন রোগী চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী, ট্রাস্টের সভাপতি ষষ্ঠী শর্মা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলা প্রচারক সুধীর চন্দ্র মণ্ডল।

চিরপথিক এক দার্শনিকের সন্ধানে

কৌশিক রায়

পুণ্যতোয়া গঙ্গা-গোদাবরী-অলকানন্দা-কৃষ্ণা-কাবেরী স্রোতস্বিনী বিধৌত ভারতবর্ষের প্রশান্ত, বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিবেশে শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধ, জিন মহাবীর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, গুরু নানকদেব, রামদাস, তেগবাহাদুর, মীরাবাঈ সকলেই জনকল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। অসৎ, কুচক্রী, ধর্মান্ধ ও অবিশ্বাসীদের দ্বারা এই মহামানবদের অনেকেই নিগৃহীত হয়েছেন। তবুও, ভারতভূমির কল্যাণে তাঁরা নিজেদের শরীর ও মন উৎসর্গ করেছেন। আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর আগে অন্ধ্রপ্রদেশের মাদানাপাল্লি-তে জাত জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি ছিলেন ঠিক এরকমই একজন প্রথিতযশা, মানবকল্যাণকামী, অসাম্প্রদায়িক, অন্ধআচার বিরোধী দার্শনিক। ৯০ বছরের সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি ছিলেন প্রাচীন গ্রিসের সক্রেতিস ও দিওগেনেসের মতোই চিরপথিক। মানুষের বিভিন্ন রূপ, কৃষ্টি, জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতি, অনুভূতিকে উপলব্ধি করার জন্য, স্বার্থহীনভাবে মানবসেবার জন্য তিনি দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কখনও তিনি তাঁর পূত সান্নিধ্য দ্বারা ধন্য করেছেন চেন্নাইয়ের শিষ্য ও অনুরাগীকুলকে। আবার কখনও স্বামী বিবেকানন্দের চিরপরিব্রাজক পদাঙ্ককে অনুসরণ করেই জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি বাসা বেঁধেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের ওইয়াইতে আবার কখনও ইংল্যান্ডের ব্রকউড পার্কে। দৈনন্দিন, আটপৌরে, ষড়রিপুর তাড়নায় ধূসরিত গার্হস্থ্য জীবনকেও যে অধ্যাত্মচেতনার দ্বারা নির্লোভ, সমৃদ্ধ, নিষ্কলুষ করে তোলা যায়, সেটা জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি দেখিয়েছিলেন তাঁর উপদেশাবলী এবং প্রকাশিত গ্রন্থনিচয়ের মাধ্যমে। 'আত্মানাম্ বিদ্ধি'-নিজেকে জানা— এই আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে কৃষ্ণমূর্তি সবাইকে বিশ্বমানবতাবোধের অন্তরস্থিত অর্থকে জানতে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

১৪ বছরের জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তিকে দত্তক নেন চেন্নাইয়ের আদিয়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটির অন্যতম কর্ণধার ডাঃ অ্যানি বেসান্ত। বিশ্বমানবতার শিক্ষক হয়ে ওঠার পাঠ জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি শুরু করেন তখন থেকেই। তাঁর মতে— সত্যে পৌঁছোনোর কোনও নির্দিষ্ট পথ নেই। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতোই জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তিও বিশ্বস করতেন— 'যত মত তত পথ'— 'একম্ সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'— নানাবিধ ধর্মাচরণ, গোষ্ঠীবিশ্বাস এবং আরাধনার মাধ্যমে একই ঈশ্বরাত্মার কাছে পৌঁছানো যায়। তাঁর সেই সুউন্নত চিন্তাধারা বিকিরিত হয়েছে তাঁর বহু বক্তৃতা, উপদেশাবলী এবং 'The Ending of Time', 'Freedom From

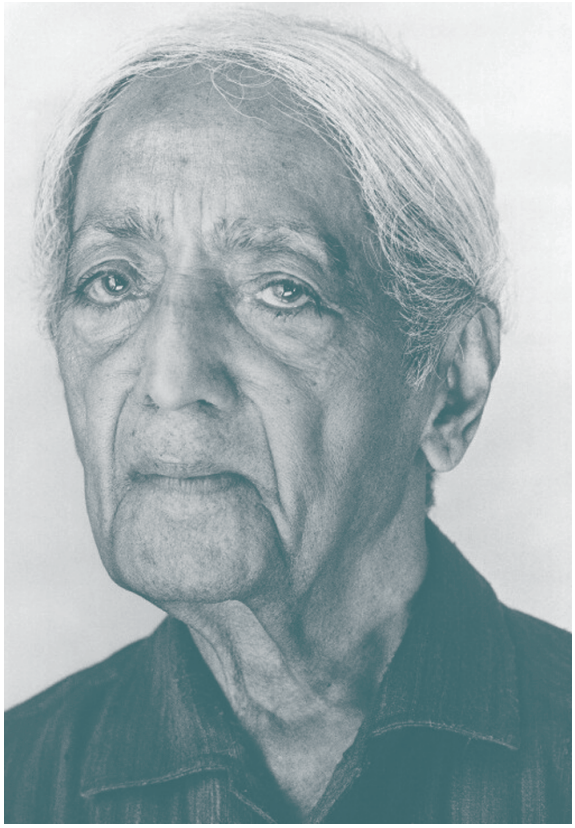

The Known' এবং 'Commentries on Living'-এর মতো আকরগ্রন্থগুলিতে। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি ছিলেন একজন আদর্শ, বৈপ্লবিক শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের মনে অতৃপ্ত বাসনা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা এবং অন্ধ ধর্মানুসরণ থেকে যে বিকৃত মানসিকতার উদ্ভব হতো— সেই অসৎ প্রবৃত্তিগুলি থেকে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি তাদের মুক্ত হতে শিখিয়েছিলেন। হীন কামনা থেকে মুক্ত হতে গেলে যে কোনও ব্যক্তি বা জাতিকে যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে জয় করতে হবে— সেটা জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি ভারত এবং বিদেশের বহু শিক্ষায়তনে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। মানসিক পরিবর্তন না হলে মানুষের আত্মিক মুক্তি সম্ভবপর নয়। আর এই স্বাধীনতাই যে কোনও রকমের প্রকৃত শিক্ষার গোড়াপত্তন করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিবা ফুলে, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবং পণ্ডিতা রমাবাঈয়ের এই আদর্শ শিক্ষাবোধই পরিপূর্ণতা পেয়েছিল জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির বাণী ও জীবনচর্যার মধ্যে। সমাজগঠন এবং প্রকৃত জ্ঞানমূলক শিক্ষার মধ্যেই যে প্রকৃত সংযোগ লুকিয়ে আছে— সেটা দেখিয়েছিলেন জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি। এই আদর্শ রূপায়ণের জন্যই অন্ধ্রপ্রদেশে ঋষি ভ্যালি স্কুল বিদ্যালয়টির স্থাপনা করেছিলেন তিনি। জটিল এবং সমস্যামুখর বর্তমান বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য বৌদ্ধিক এবং সাহসিকতাপূর্ণ অন্তরাত্মার গঠন যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতে পারে— তার জন্য সদাই সচেষ্ট ছিলেন তিনি। পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং বনসৃজনের জন্যও শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষদের তিনি উদ্যোগী করে তোলেন।

এক্ষেত্রে কৃষ্ণমূর্তিকে পরিবেশ আন্দোলনে প্রবাদপ্রতিম হয়ে ওঠা

ডাঃ র‍্যাচেল কার্সন, সুন্দরলাল বহুগুণা, ডাঃ নরম্যান বোরলগের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। শিক্ষাঙ্গনে যাতে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে গিয়ে জ্ঞান বিতরণের অবাধ স্বাধীনতা থাকে এবং শিক্ষক- শিক্ষিকাদের সঙ্গে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভয় ও আতঙ্কের, বাধ্যবাধকতার অনভিপ্রেত সম্পর্ক না গড়ে ওঠে, তার জন্য সতর্ক ছিলেন জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি। শিক্ষার অর্থ তোতাপাখির মতো তথ্যের নির্বোধ অনুকরণ নয়, নীরস তথ্যভাণ্ডার থেকে প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করা সেটাও বুঝিয়ে দেন কৃষ্ণমূর্তি তাঁর রচনাতে। তিনি লেখেন— 'A School is a place where one learns about the totality of life, the wholeness of life.' মুক্ত মননকেই জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি 'প্রকৃত মেধাজ্যোতি' বলে বর্ণনা করেছিলেন। মনের মধ্যে 'তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি' জমা হলে যে সর্বক্ষেত্র থেকে নিঃসংকোচে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়— সেটা কৃষ্ণমূর্তি বুঝিয়ে বলেছিলেন। প্রকৃতির সুররূপ- বর্ণকে জানার মধ্যেও যে শিক্ষার প্রাসঙ্গিকত আছে, সেটা বলেছিলেন কৃষ্ণমূর্তি। আমাদের মনের গভীরতম প্রদেশে যখন ধর্মীয় ভাবনা এবং বৈজ্ঞানিক ভাবনার সমসত্ত্ব সম্মেলন ঘটে, তখনই আমাদের মনে প্রকৃত এবং সদর্থক ভাবনার উদয় হতে শুরু করে। তাই তিনি লিখেছিলেন, 'A human being is a true human being when the scientific spirit and the true religious spirit go together.'

নিস্তব্ধতা এবং প্রশান্তচিত্ততাকে পাথেয় করেই শাক্যমুনি, বুদ্ধ, জিন মহাবীর, লাওৎজে, জরাথুষ্টের মতো ধর্মপ্রচারকরা মানব- জীবনের প্রকৃত শিক্ষক হতে পেরেছিলেন। সেইজন্য বিদ্যালয় শিক্ষার একটি অন্যতম আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে শান্ত, মৌন পরিবেশের কথা সবসময়েই বলতেন জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি। প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা বিদ্যালয়গুলির মধ্যেই এই প্রশান্তি নিহিত আছে। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশীয় সংস্কৃতির আদান প্রদান করে প্রতিটি বিদ্যালয়কে একটি বিশ্বায়তনে পরিণত করাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তিনি।

বর্তমানে চেন্নাইয়ের বসন্ত বিহারে স্থাপিত কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন এবং রাজঘাট, উত্তরকাশী, সহ্যাদ্রি, কলকাতা, কটক, মুম্বাই ও বেঙ্গালুরুতে এই শিক্ষায়তনের শাখাগুলি জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির সেই বিশ্বজনীনতাকেই চিহ্নিত করছে। □

মাতঙ্গিনী হাজরা

সুতপা বসাক ভড়

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ সাল। ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা সেদিন মেদিনীপুরে একটি মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, বেশিরভাগ মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে প্রায় ছ' হাজার স্বাধীনতাকামী ভারতীয় সেদিন ওই জেলা থেকে ব্রিটিশ শাসন নির্মূল করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সূচনা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সেজন্য তমলুক থানা দখল করার পরিকল্পনা করে এই মিছিল বের করেন। শহরের কাছে পৌঁছালে ১৪৪ ধারা জারি করে ব্রিটিশ পুলিশ ওই সমাবেশ ভেঙে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। এই অন্যায় আদেশ মেনে নেননি বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা। তিনি মিছিলের সামনে থেকে এগিয়ে চলেন। পুলিশ তাঁকে গুলিবিদ্ধ করে; কিন্তু তা সত্ত্বেও মাতঙ্গিনী হাজরাকে থামানো যায়নি। তিনি জনতার ওপর গুলিবর্ষণ না করার আবেদন জানান পুলিশের কাছে।

বিপ্লবী পত্রিকা— যা তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মুখপত্র ছিল, সেটিতে বর্ণিত 'ফৌজদারি আদালত ভবনের উত্তর দিক থেকে মাতঙ্গিনী একটি মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পুলিশ গুলি চালালে তিনি অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের পেছনে রেখে নিজেই এগিয়ে যান। পুলিশ তিনবার তাঁকে গুলি করে। গুলি লাগে তাঁর কপালে ও দুই হাতে। তবুও তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন। এর পরেও বার বার তাঁর ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়। পতাকাটি মুঠোর মধ্যে শক্ত করে উঁচিয়ে ধরে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। —Maily, Sachindra (1975) Freedom Movement in Midnapore (P. 112-113)

মাতঙ্গিনী হাজরার জন্ম হয় ১৮৬৯ সালের ১৯ অক্টোবর (আনুমানিক)। তমলুকের কাছে আলিনান নামে এক ছোট্টগ্রামের গরিব কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। প্রথাগত শিক্ষাগ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় দারিদ্রতা। মাত্র আঠেরো বছর বয়সে তিনি বিধবা হয়েছিলেন।

১৯০৫ সালে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। ১৯৩২ সালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। লবণ আইন আমান্য করে ওইসময় তিনি কারবরণ করেছিলেন। কিছু সময় পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলেও কর মকুবের দাবিতে প্রতিবাদ জানাতে থাকলে তাঁকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হয়। এই সময়ে তিনি ছ' মাস বহরমপুর কারাগারে বন্দিজীবন কাটান। কিছুদিন হিজলি বন্দি নিবাসেও ছিলেন। চরকা কেটে স্বদেশি কাপড়ও বানাতে আরম্ভ করেন।

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার স্বদেশের জন্য মাতঙ্গিনী হাজরার মৃত্যুবরণের দৃষ্টান্তটিকে সামনে রেখে মানুষকে বিপ্লবের পথে উদ্বুদ্ধ করেছিল। উল্লেখযোগ্য, এই সমান্তরাল সরকারটি ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সফলভাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। পরে গান্ধীজীর অনুরোধে এই সরকার ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তিনি 'গান্ধীবুড়ি' নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর এই বলিদানকে আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ ও নমন করে আমাদের প্রণাম নিবেদন করছি। □

বারবার আক্রান্ত হয়েও অবিচল সোমনাথ

সূর্য শেখর হালদার

দেবাদিদেব মহাদেব সনাতন ধর্মের অন্যতম পূজনীয় দেবতা। তিনি আদিদেব, আদিগুরু। তুলসীদাসের রামচরিত মানস বলছে সমুদ্রে সেতুবন্ধনের পূর্বে শ্রীরাম, স্বয়ং মর্যাদা পুরুষোত্তম, পূজা করেছিলেন দেবাদিদেবের। তিনি হলেন রামেশ্বর অর্থাৎ শ্রীরামের ঈশ্বর।

শিব পুরাণ ও নন্দী উপপুরাণে দেবাদিদেব নিজেই বলেছেন যে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু বারোটি স্থানে তিনি জ্যোতির্লিঙ্গ আকারে বাস করেন। লিঙ্গ শব্দের অর্থ হলো প্রতীক, বস্তুর সূক্ষ্ম রূপ। বৈদিক ঋষিরা সূক্ষ্ম শরীরকে লিঙ্গদেহ বলতেন। শিব যোগী মহেশ্বর। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর দেহের কণামাত্র। একদিকে তিনি রুদ্ররূপী, অন্যদিকে মঙ্গলময়। সেই বৈদিক যুগেই তৈরি হয়েছিল শিবলিঙ্গ— মহাজ্যোতির প্রতীক জ্যোতির্লিঙ্গ হিসেবে। এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। আজও ধর্মপ্রাণ মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করতে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম গুজরাটের প্রভাসতীর্থের সোমনাথ।

প্রজাপতি দক্ষের সাতাশটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল চন্দ্রদেবের। তাঁরা সকলেই গুণবতী এবং সুন্দরী। কিন্তু চন্দ্রদেব সবথেকে বেশি ভালোবাসতেন রোহিণীকে। রোহিণীকে নিয়েই তিনি কাটাতেন সময়, অন্যদের দিকে তাকাতেনই না।

দক্ষের কন্যারা এতেই কুপিত হলেন এবং নালিশ জানালেন পিতার কাছে। দক্ষ চন্দ্রদেবকে উপদেশ দিলেন স্ত্রীদের সমান মর্যাদা দিতে। চন্দ্রদেব চুপ করে শুনলেন, কিন্তু ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন আনলেন না। রোহিণী বাদে অন্য স্ত্রীরা আবার অভিযোগ করলেন পিতার কাছে। এইবার কুপিত দক্ষ অভিশাপ দিলেন চন্দ্রদেবকে, 'দক্ষঃ প্রকুপিতশ্চন্দ্রং শশাপ মন্ত্রপূর্বকম্ দ্রুতং শশুর শাপেন যক্ষ্মাগ্রস্তং বভূব সঃ।'

দক্ষ প্রজাপতির অভিশাপে যক্ষ্মাগ্রস্ত হলেন চন্দ্রদেব। অর্থাৎ ক্ষয় রোগ আক্রান্ত হলেন চন্দ্রদেব। চন্দ্রদেবের এই করুণ পরিণতিতে বিচলিত হলেন দেবতারা। ক্ষয় রোগের কারণে চন্দ্রের তেজ কমে গেল, স্নিগ্ধ মনমাতানো রূপ অদৃশ্য হলো।

দেবতারা তখন পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গেলেন। চন্দ্রের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন তিনিও। তবুও তিনি বললেন প্রভাস তীর্থে গিয়ে শিবের তপস্যা করলে তবেই শিবের আশীর্বাদে চন্দ্র আবার সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন। চন্দ্রদেব তখন প্রভাস তীর্থ গিয়ে ছয় মাস ব্যাপী দেবাদিদেবের আরাধনা করলেন। গভীর আরাধনার পর প্রকট হলেন দেবাদিদেব। চন্দ্রকে বর প্রার্থনা করতে বললেন তিনি। চন্দ্র

বললেন তাঁর অনুপস্থিতিতে মানুষের কষ্ট হচ্ছে। গভীর অন্ধকারে ডুবে গেছে রাতগুলো। তাদের সেই স্নিগ্ধ সুন্দর রাত ফিরিয়ে দিতে তাঁকে যেন সুস্থ হয়ে ওঠার বর দেন দেবাদিদেব।

দেবাদিদেব বললেন দক্ষের অভিশাপ পুরোপুরি কাটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এই অভিশাপ খানিকটা তিনি বদলে দিতে পারবেন। মাসে চোদ্দ দিনে চন্দ্রের জ্যোতি পৃথিবীবাসীকে আলো দেবে। তারপর চন্দ্রের জ্যোতি কমে গিয়ে অন্ধকারে কাটবে কয়দিন। তারপর আবার চন্দ্রের জ্যোতি ফিরে আসবে। আর চোদ্দ দিনের শেষ দিনটিতে চন্দ্র পূর্ণ মহিমায় আলোকিত হয়ে উঠবে। প্রত্যেক মাসের এই দিনটিকে পূর্ণিমা বলে মানুষজন অভিহিত করবে এবং এই দিনটি হবে পবিত্র। চন্দ্র আরও সুন্দর হয়ে উঠবে আর পৃথিবীবাসীর আরও বেশি করে সেবা করতে পারবে।

তখন চন্দ্র দেবাদিদেবকে বললেন, 'এই স্থানে আমি তোমার দেখা পেয়েছি। এই স্থানে তুমি অধিষ্ঠান কর। আর আমাকে স্থান দাও তোমার অঙ্গে।' সেই থেকে চন্দ্রের আরেক নাম সোমদেব। সোমদেব আরাধনা করেছিলেন বলে এই জ্যোতির্লিঙ্গের নাম হয় সোমনাথ। আর চন্দ্রদেব এইখান থেকেই পুনরায় প্রভাসিত বা আলোকিত হলেন বলে এই স্থানের আরেক নাম প্রভাস। এই ঘটনার পর থেকেই আমরা শিব ঠাকুরের কপালে চন্দ্রদেবের অবস্থান দেখতে পাই।

প্রভাস তীর্থের মহিমার কথা আমরা পাই ঋক্‌বেদ, মহাভারত, শ্রীমদ্ ভাগবত ও স্কন্দপুরাণে। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন এই সোমনাথ মন্দির থেকে। মহাভারতের নায়ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নরলীলা সাঙ্গ করেছিলেন এই সোমনাথ মন্দিরের কাছেই।

সোমনাথের মন্দির প্রথম কবে তৈরি হয় তা আজও অজানা। অল বেরুনির ভারত বিবরণে উল্লেখ পাওয়া যায় সোমনাথের সুবিশাল প্রাচীন মন্দিরের। তখন নিত্য গঙ্গাজলে সেবা হতো সোমনাথের অভিষেকের জন্য। গজনীর সুলতান মাহমুদ এই মন্দির ধ্বংস ও লুটপাট করেছিলেন ১০২৫ সালে। সৌরাষ্ট্রের রাজা তখন ছিলেন প্রথম ভীম দেব। তাঁর পুত্র কামদেব গজনির সুলতানকে মন্দিরের সামনে পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। সেখানেই বীরগতি প্রাপ্ত হন এই বীর যোদ্ধা।

এর বেশ কিছুদিন বাদে সৌরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় বাঘেলা বংশ (১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে)। বাঘেলা বংশের শেষ রাজা কর্ণদেবের সময় আলাউদ্দিন খিলজি আক্রমণ ও লুটপাট করেন সোমনাথ মন্দির। চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয় জ্যোতির্লিঙ্গ। জুনাগড়ের রাজা মহিপালের সময় আবার তৈরি হয় মন্দির, প্রতিষ্ঠা করা হয় শিবলিঙ্গ।

আবার ১৩৯৪ সালে গুজরাটের মুসলমান শাসনকর্তা সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করলেন। উদ্দেশ্য সেই এক সম্পদ লুণ্ঠন। সেবার লিঙ্গ মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো, মন্দিরের উপাদান দিয়ে তৈরি হলো মসজিদ। সোমনাথের সেই প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনো আরব সাগরের তীরে অতীতের অত্যাচারের সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। শেষবার এই মন্দিরের উপাদান দিয়ে মসজিদ তৈরি হয়েছিল মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়। সেটা ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে।

১৭৮৩ সালে হোলকারের ধর্মপ্রাণ মহারানি অহল্যাবাঈ আদি মন্দিরের কাছে তৈরি করেন নতুন মন্দির। মাটির নীচে প্রতিষ্ঠিত হয় জ্যোতির্লিঙ্গ। উদ্দেশ্য বিধর্মীদের হাত থেকে জ্যোতির্লিঙ্গকে রক্ষা করা। কিন্তু তাও শেষ রক্ষা হয়নি। সেই মন্দিরের অস্তিত্ব এখনও আছে। ছোটো দ্বিতল মন্দির। ওপরের তলায় ছোটো জ্যোতির্লিঙ্গ অবস্থিত। তার নীচে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ভূগর্ভে নেমে যেতে হয়। স্বল্প পরিসর ভূগর্ভস্থ-গর্ভমন্দিরে সোমনাথের মূল জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমানে যে মন্দির আছে তা স্বাধীন ভারত সরকার তৈরি করে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন ভারতের প্রথম গৃহমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ব্যবস্থাপনায়। সোমনাথ মন্দিরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ওপরে এই মন্দির তৈরি হয়। একেবারে সমুদ্রের ওপর ধূসর রঙের গ্রানাইট পাথরের অপূর্ব কারুকার্যখচিত মন্দির। পটভূমিতে নীল আকাশ আর নীল সমুদ্রের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মানানসই মন্দির। মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নতুন জ্যোতির্লিঙ্গ। আর পশ্চিম দেওয়ালে শ্বেত পাথর দ্বারা নির্মিত বিশালাকার পার্বতীর মূর্তি। মন্দিরের ভিতরে নাটমন্দির আয়না ও সুন্দর ছবি দ্বারা সজ্জিত। পিছনে দাঁড়িয়ে আয়নার প্রতিবিম্ব দ্বারা সামনের সোমনাথকে দেখা যায়। আর মন্দিরে প্রবেশের মুখে গ্রানাইট পাথরের তৈরি কারুকার্য করা এক অপূর্ব তোরণ। এই তোরণ তৈরি করেছিলেন জামনগরের রানি তাঁর স্বর্গত স্বামী দিগ্‌বিজয় সিংজীর স্মরণে।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রাচীন ব্রহ্মশিলার ওপরে মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য, এটি সোমনাথের সপ্তম জ্যোতির্লিঙ্গ ও মন্দির। এর আগে ছ'বার জ্যোতির্লিঙ্গ ও মন্দির ধ্বংস ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বাদশ ত্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম সোমনাথ আজও ভারতের এক পবিত্রতম তীর্থ।

সৌরাষ্ট্র দেশে বিশদেহতিরস্যে
জ্যোতির্ময়ং চন্দ্রকলাবতংসম
ভক্তিপ্রদানায় কৃপাবতীর্ণং
তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে। □

ভারতবর্ষে হালাল সার্টিফিকেশন এক সমান্তরাল অর্থব্যবস্থা

ড. প্রদোষ রঞ্জন ঘোষ

হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির রমেশ সিন্ধের মতে হালাল অর্থব্যবস্থা ভারতবর্ষে এক সমান্তরাল সাম্রাজ্যবাদী অর্থব্যবস্থা হিসেবে চলেছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনোত্তর ভারত পাশ্চাত্য ধারণার সেকুলারবাদীদের দখলেই রয়ে গিয়েছে। তথাকথিত মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোটব্যাঙ্ক দখলের স্বার্থে আজ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন ধর্মান্ধ আদবকায়দা সেকুলার তকমার আড়ালে প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। ফলস্বরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮৫ শতাংশ) হিন্দুরা বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত হয়ে আসছে। মুসলমানদের (১৫ শতাংশ) আবদার ধর্মীয়ভাবে সম্মত ও স্বীকৃত হালাল নীতি চালু করতে দিতে হবে, এভাবেই সেকুলারিজমের আড়ালে ইসলামিকরণ ও ইসলামি অর্থব্যবস্থাকে (হালালোনোমিক্স) চালু করার প্রচেষ্টা হয়ে চলেছে। এইভাবে প্রায় দুই ট্রিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সমান্তরাল অর্থব্যবস্থা হতে চলেছে এই হালালোনোমিক্স।

ভারতে 'জামাত-উলেমা-ই-হিন্দের' হালাল ট্রাস্ট কোষাগারের অন্যতম প্রধান সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকারী সংস্থা। এই সংস্থা প্রকাশ্যেই স্বীকার করে ভারতে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী ঘটনায় ধৃতদের আইনি লড়াইয়ের জন্য (সংখ্যায় প্রায় ৭০০) অর্থ সাহায্য করে করে থাকে। অর্থাৎ ঘুরপথে হিন্দুরা হালাল সার্টিফায়েড বস্তু কিনে সন্ত্রাসবাদীদের তহবিল গড়তে সাহায্য করছে এবং ক্রমশ নিজেদের অংশীদারত্ব পঙ্গু করে ফেলছে। হিন্দুদের দাস মনোবৃত্তির কারণেই হালাল অর্থনীতি ভারতে প্রসার লাভ করছে যা আগামীদিনে ভারতবর্ষীয় জীবনের অস্তিত্বই প্রবল সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

হালাল সম্বন্ধে ইন্টারনেটে 'হালাল ইন্ডিয়া ডট কম উট ইন' থেকে সমস্তরকম তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা আছে। এদের এক্তিয়ারে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও পানীয় ৩৮ শতাংশ, ফার্মাসিউটিক্যাল ২৩ শতাংশ, বেকারিপণ্য ১৩ শতাংশ, প্রাথমিক মাংস ১১ শতাংশ, প্রসাধনী ও ব্যক্তিগত যত্ন ৯ শতাংশ, নিউট্রাসিউটিকল ৬ শতাংশ এদের নিবেদিত সেবা পণ্য শংসাপত্র। রেস্তরাঁশংসাপত্র, পর্যটন, মেডিক্যাল টুরিজম, হালাল প্রশিক্ষণ, গুদাম শংসাপত্র ও হালাল গাইডেন্স। এদের প্রচার হালাল শংসাপত্র ১১৭টি দেশে বাণিজ্য অনুমতি পেতে প্রয়োজনীয় একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত শংসাপত্র। প্রতিবছর ১ নভেম্বর 'বিশ্ব হালাল দিবস' যাপন করা হয়। ভারতে এদের

আমাদের দেশেও বিভিন্ন রাজ্যে ও শহরে এমনকী পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন বাজার ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং পেশা ক্রমশ মুসলমানদের দখলে চলে আসছে। ন্যাশনাল পার্টি অব অস্ট্রেলিয়ার জর্জ ক্রিসটেনসেন দাবি করেন, অস্ট্রেলিয়ার হালাল অর্থনীতির টাকা সেদেশে শরিয়তি আইন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের দেওয়া হয়।

কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা হলো ওখলাগ্রাম, হাসিয়ানগর, নতুনদিল্লি-১১০০২৫ এবং ট্রিপলিকেন হাইরোড, ট্রিপলিকেন, চেন্নাই-০০০০০০৫।

● হালাল অর্থব্যবস্থার পরিকল্পনা :

মালয়েশিয়ার 'ইসলামিক ব্যাঙ্ক অ্যাক্ট ১৯৮৩' অনুসারে 'ইসলামিক ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স (আইবিএফ) ব্যাঙ্কের গঠন হয়। এই ব্যাঙ্ক শরিয়তি কানুনে চলে, সেজন্যে অমুসলমান দেশগুলিতে যেমন ভারতে বেআইনি। সেক্ষেত্রে ভারতে এদের টাকাপয়সার আদানপ্রদান হাওলার (বেআইনি) মাধ্যমে করা হয়। ২০১১ সালে মালয়েশিয়া সরকার স্থানীয় বাণিজ্য মন্ত্রালয়ের উদ্যোগে 'হালাল প্রোডাক্ট ইনডাস্ট্রি (এইচপিআই) শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে কুয়ালালামপুরে ওয়ার্ল্ড হালাল রিসার্চ এবং ওয়ার্ল্ড হালাল ফোরামের অধিবেশনে হালাল অর্থব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। হালাল প্রোডাক্ট ইন্ডাসট্রি এবং ইসলামিক ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে হালালোনোমিক্সকে শক্তিশালী করতে সুনিশ্চিত করা হয়। এর প্রসারের জন্য নিজেদের অর্থসাহায্যে 'সোশ্যাল অ্যাকসেপটেবল মার্কেট ইনভেস্টমেন্ট (এসএএমআই)' 'হালাল ফুড ইনডেক্স' শুরু করে। বিশ্বে এই ধরনের প্রয়াস এই প্রথম। এইচএসবিসি (বহুরাষ্ট্রীয় নিবেশ অভিকোষ)-র মালয়েশিয়ার ডিরেক্টর রেফ হানিফ হালাল অর্থব্যবস্থার প্রসারের জন্য উৎপাদন থেকে ক্রেতা পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদানের প্রস্তাব রাখেন। লাভের অংশ থেকে হালাল অর্থব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই প্রস্তাবনার পর ২০০০ সাল থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ইসলামিক ব্যাঙ্কের সম্পত্তির পরিমাণ ২২

ফঃ ৫

শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ হালাল অর্থব্যবস্থা এইভাবে দুনিয়ায় দ্রুত বর্ধনশীল অর্থব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছে। অরগেনাইজড সেক্টরে হালাল অর্থব্যবস্থা ৪.৫৪ লক্ষ কোটি আমেরিকান ডলার ছাড়িয়ে গেছে এবং ২০২৫ সাল নাগাদ ৯.৭১ লক্ষ কোটি ডলার হয়ে উঠবে। তুলনায় আনঅর্গানাইজড সেক্টরে পরিধি আরও বৃহৎ। সুতরাং হালাল অর্থব্যবস্থার ব্যাপ্তি সহজেই অনুমান করা যায়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিশ্বে মাত্র ১২-১৫ শতাংশ মুসলমান ক্রেতা অর্থাৎ হালাল বস্তুর ৮৫ শতাংশ ক্রেতারা অমুসলমান।

● হালাল মাংসের গুণমান :

আহারের প্রয়োজনে পশুবধের বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন নিয়মকানুন করা হয়েছে। লক্ষ্য হলো আহারযোগ্য প্রাণীটিকে বধ করার পদ্ধতি যেন যথাসম্ভব মানবিক হয় এবং গ্রহণীয় মাংস স্বাস্থ্যবিধি সম্মত হয়।

বিশ্বজুড়ে দুটি প্রধান ধর্মীয় পশুবধ পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন হয়ে আসছে, 'কোশার' (আকা শেচিতাহ) এবং 'হালাল' (আকা ধাবিহাহ)। কৌশলের দিক থেকে দুই পদ্ধতিই মুদ্রার এপিট ওপিট যথাক্রমে ইহুদি ও মুসলমানদের দ্বারা প্রচলিত। অন্যদিকে 'ঝট্‌কা পদ্ধতি' প্রধানত হিন্দু ও শিখদের দ্বারা প্রচলিত। হালাল পদ্ধতিতে পৃষ্ঠদেশের সুষুম্নাকাণ্ডকে অক্ষত রেখে গলার অঙ্কীয়তলের নলী কাটা হয়, অন্যদিকে ঝট্‌কা পদ্ধতিতে এককোপে ঘাড় থেকে মুণ্ডচ্ছেদ করে ধড় থেকে আলাদা করা হয় সুষুম্নাকাণ্ড-সহ। ঝট্‌কায় প্রাণীটিকে তুলনামূলকভাবে অল্পই কষ্ট সহ্য করতে হয়। তবুও মাংস ব্যবসায় ব্যাপকগুরুত্ব থাকায় বিশ্বজুড়ে হালাল পদ্ধতিই বেশি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হালাল ইন্ডিয়া কোম্পানি দাবি করে তাদের পদ্ধতিতে বধ করা মাংস স্বাস্থ্যকর। যদিও এই মতবাদ শুধুমাত্র ইসলামি প্রচারের জন্যই। এই দুই বিপরীত পদ্ধতি দ্বারা প্রাপ্ত মাংস কতটা বিজ্ঞানসম্মত, মানবিক ও নীতি সম্মত? এ প্রসঙ্গে আমেরিকায় গবেষণারত ড. দে প্রকাশিত রিভিউর অংশ বিশেষ (বঙ্গদেশ ডটকম,১২ জুন ২০১৯) এখানে উল্লেখ করা হলো—

(১) দেহে কোনো অনুভূতি প্রথম জ্ঞাত হয় দেহকোষে অবস্থিত 'কগনেট' গ্রাহক প্রোটিন দ্বারা, পরবর্তীস্তরে এই অনুভূতি নার্ভ দ্বারা প্রবাহিত হয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছায়। মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া হওয়ার পর পুনরায় পর্যায়ক্রমে মস্তিষ্ক থেকে সুষুম্নাকাণ্ডের মাধ্যমে দেহের কারক অংশে (পেশী ও অন্তক্ষরা গ্রন্থী) পৌঁছায়। হালাল করা হলে সুষুম্নাকাণ্ডের ক্রিয়াপথটি অক্ষুণ্ণ থাকায় অনুভূতি ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল হওয়ায় পশুটির যন্ত্রণা মৃত্যু পর্যন্ত চালু থাকে। অন্যদিকে ঝটকার ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ আজ্ঞাবাহী পথটি রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণার অনুভব বন্ধ হয়ে যায়।

(২) অবোলা গৃহপালিত জীব সবসময় তাদের যন্ত্রণা প্রকাশ করে উঠতে পারে না কিন্তু ইইজি (electro encephalogram) দ্বারা এই কষ্ট জানা যায়। বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ যে, ঝটকায় ৫-১০ সেকেন্ডের মধ্যেই গুরুমস্তিষ্কের কার্যকারিতা স্তব্ধ হয়ে যায়। ফরাসি, ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা যায় যে, হালাল করা হলে দেহের ক্ষতিকর উদ্দীপনার চেতন ঘটে, ফলে সংশ্লিষ্ট পশুটি অসহ্য যন্ত্রণা পেতে থাকে। গোরু, বলদ ও ছাগলের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে হালাল বা কোশার করা হলে তিনটি স্ট্রেস হরমোন যথা কর্টিসল, নরঅ্যাড্রিনালিন ও ডোপামাইন ক্ষরণ ৩০-৫০ শতাংশ বেড়ে যায়। অধিক যন্ত্রণা থেকে উৎপন্ন স্ট্রেস হরমোনগুলি অধিক্ষরণের ফলে পেশীতে সক্রিয় সমস্ত গ্লাইকোজেন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং বাজারে নিয়ে আসা পর্যন্ত আর কোনো ল্যাকটিক অ্যাসিড অবশিষ্ট থাকে না, ফলস্বরূপ p^H অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ায় ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়ার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মাংস শুষ্ক, শক্ত ও কালো বর্ণের হয়ে পড়ে। অন্যদিকে স্টেরয়েড জাতের স্ট্রেস হরমোনগুলি কোষপর্দা ভেদ করে নিউক্লিয়ার ডিএনএ গ্রাহকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোষে অপরিবর্তনীয় জেনেটিক পরিবর্তন ঘটায়, যার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। আমেরিকার ন্যাশানাল ইন্‌স্টিটিউট অব হেল্‌থ অন্য পরীক্ষায় দেখেছে যে, ভেড়াতে স্ট্রেস হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার পর মাংসের গঠন ও স্বাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

● হালাল বনাম ঝট্‌কা আন্দোলন :

হিন্দু ও শিখদের ঝট্‌কা সার্টিফিকেশনের প্রচলনের আন্দোলন :

শিখদের দশমগুরু গুরুগোবিন্দ সিংহ মাংস খেতে চাওয়া খালসাদের শুধু ঝট্‌কা মাংস খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। শিখ মতে হালাল মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। হিন্দুদের মধ্যে যদি ঝট্‌কা মাংস খাওয়ার চাহিদা/দাবি বেড়ে ওঠে তবে হিন্দু কসাইদের রুজি রোজকার টিকে থাকবে এবং নিশ্চিত হওয়া যাবে যে হালাল অর্থনীতির তহবিল গড়তে হিন্দুরা সাহায্য করছে না আর ধর্মকে অবনমনের হাত থেকেও রক্ষা করবে।

সরদার রবিরঞ্জন সিংহ যিনি ড. ঝট্‌কা এবং কিং অব ঝট্‌কা নামে জনপ্রিয়। তিনি হিন্দু মহাসভার একজন সক্রিয় সদস্য এবং রামজন্মভূমির মামলাকারী হালালোনোমিক্সের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের অগ্রগামী নেতা। গত এক দশক ধবে তিনি ঝট্‌কা আন্দোলনের দেশজুড়ে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। তার নেতৃত্বে দেশে 'ঝট্‌কা সার্টিফিকেশন অথরিটি' গড়ে উঠেছে যারা ঝট্‌কা সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে।

● হালাল শংসাপত্র বস্তুর বিক্রি ভারতে এক বেআইনি উদ্যোগ :

হালাল দ্রব্যের একচেটিয়া বাজারিকরণের বিরুদ্ধে এবং ঝট্‌কার প্রচলনের জন্য জনজাগরণ ও আন্দোলন ভারতে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কারণ হালালিকরণের ফলে অমুসলমানদের বঞ্চিত করা হচ্ছে যার মধ্যে অধিকতর বঞ্চনার শিকার হয়ে উঠেছে দলিত, তফশিলি জাতি ও উপজাতির জনগোষ্ঠীর লোকেরা যারা এই পেশায় যুক্ত। 'অপ ইন্ডিয়া ডট কম'-এর ইংরেজি সংস্করণের সম্পাদিকা নুপুর শর্মার প্রচারিত প্রতিবেদনে হালাল বস্তুর বিক্রির প্রতি পক্ষপাতিত্বের এবং এজন্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ করা হয়। প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান ব্যবসার পৃষ্ঠপোষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে, এমনকী সুদূর ব্রিটেন থেকেও মন্তব্য করা হয়েছে (জানা গেছে এরা লেবার পার্টির সঙ্গে যুক্ত) এবং ভবিষ্যতে এই প্রকার রচনার জন্য বিজ্ঞাপন বন্ধ করার হুমকিও দেওয়া হয়।

ঝট্‌কা আন্দোলনের প্রচারের একজন অগ্রগণ্য এবং সক্রিয় সদস্য সুপ্রিম কোর্টের তরুণ অ্যাডভোকেট ও সমাজকর্মী ইসকরণ সিংহ ভাণ্ডারী। তথ্য দিয়ে তিনি জানাচ্ছেন

যে, বিদেশে (ব্রিটেন, কানাডা ইত্যাদি) হালাল মাংস নিষিদ্ধ অথচ ভারতে বিভিন্ন সরকারি (যেমন এয়ারইন্ডিয়া) ও বেসরকারি (যথা ম্যাকডোনাল্ড) সংস্থাগুলি শুধুমাত্র হালাল মাংসই কেনা-বেচা করে থাকে যেখানে ভারতীয় সংবিধান ও আইনের চোখে সামাজিক, আর্থিক ও ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও বেআইনি। এদেশে ক্রেতার অধিকার অস্বীকার করা হচ্ছে, জোর করে ইসলামিক স্বীকৃত জিনিসই নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই প্রকার হালাল হেজিমনি ও হালাল মনোপলির বিরুদ্ধে জনজাগরণ ও জনআন্দোলনের দাবিতে হালাল শংসাপত্রের সমান্তরাল 'ধর্মীয় সার্টিফিকেট' চালু করার জন্য তার প্রচারের সমর্থনে ইতিমধ্যে প্রায় এক লক্ষের অধিক সই সংগ্রহ করে (আন্দোলনে যোগদানের জন্য http://www.change.org /p/government of...) ভারত সরকারের খাদ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন করেছেন। ভারতের অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সচেতনতার জন্য সংবিধানের আইনি তথ্য তুলে তিনি জানাচ্ছেন যে সংবিধানের 'সমতার অধিকার' আর্টিকেল ১৪-১৮ অনুসারে ধর্ম, জাতি, কাস্ট, লিঙ্গ, সম্প্রদায়, জন্মস্থান, বাসস্থান ও নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্ব রাষ্ট্রকর্তৃক সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও বেআইনি। আর্টিকেল ১৬ ও ১৯-এ আরও বলা হয়েছে যে সাম্যের অধিকারে রাষ্ট্র তফশিলি জাতি ও জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত অধিকার অনুসারে ব্যবসা ও অন্য কারবারের অধিকারে বঞ্চিত করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও বেআইনি। 'প্রিভেনশন অব অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্ট ১৯৮৯' অনুসারে উক্ত অধিকারের লঙ্ঘন করা হলে ৫ থেকে ৭ বছর জরিমানা-সহ জেলবাস নির্ধারিত করা আছে। এইরূপ পক্ষপাতিত্বের জন্য হিন্দুদের মধ্যে ঘাটিক কাস্ট, কসাই সম্প্রদায় ও শিখদের একাংশ ক্রমশ কর্মহীন হয়ে পড়ছে অথচ বেআইনি এই ব্যাপারগুলো ঘটে চলেছে মাত্র পনেরো শতাংশের স্বার্থে, বাকি পঁচাশি শতাংশের ন্যায্য দাবি অস্বীকার করা হচ্ছে অসংবিধানিকভাবে। এই অনুসারে উন্নয়নের নামে কোনো এক সম্প্রদায়কে পক্ষপাতিত্ব করা (যেমন পশ্চিমবঙ্গে হয়ে চলেছে), ভিন রাজ্যের শ্রমিক/কর্মপ্রার্থীকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাও একইভাবে সাংবিধানিক নীতির লঙ্ঘন।

● হালাল বস্তুর বিক্রির আইনগত বৈধতা :

পক্ষপাতিত্ব অবৈধ, কিন্তু আদৌ কি হালাল শংসাপত্রধারী দ্রব্য ভারতে বিক্রি করা যায়? ঘটনাটি প্রচারের আলোকে আসে যখন ঝাড়খণ্ড রাজ্যে এক হিন্দু ফল বিক্রেতার উপর স্থানীয় সরকারের নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ডি.কে. দুবে আইনগত ব্যাখ্যায় জানাচ্ছেন যে, বাজারে লভ্য খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের জিনিসপত্তরের প্রচার ও বিক্রয় আইনগতভাবে ক্রটিযুক্ত এবং কোনোরূপ বৈধতার নীতি মানা হয় না। বিশদ আলোচনার চন্য শ্রী দুবের (DK Duhey.com) মতামত দেওয়া হলো— ব্রিটিশ সরকার যখন বুঝতে পারলো যে দুনিয়াজুড়ে তাদের রাজপাঠ উঠে যাবে তখন অর্থ রোজগারের এক পন্থা হিসেবে বিক্রয়যোগ্য বস্তুর গুণমান বিচারের জন্য ১৯৪৬ সালে 'গ্লোবাল ট্রেডমার্ক' চালু করতে আইএসও-র স্থাপনা করে যা সম্পূর্ণভাবে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের স্বাধীন ভারতের নিজস্ব মূল্যমান নির্ণয়ের জন্য 'আইএসআই' আছে এবং খাদ্যসামগ্রীর জন্য এফএসএসএআই আছে তা সত্ত্বেও আইএসও-কে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আমাদের ব্যবস্থায় প্যাকেট নং, ট্রেডমার্ক, ব্র্যান্ডিং, লোগোর ব্যবহার এবং শংসাপত্রের জন্য সরকারের নিকট রেজিস্ট্রেশন করার নিয়ম, অভিযোগ করার জন্য ভারত সরকারের রামমোহন রায় সংস্থা রয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে দুনিয়াজুড়ে ১৬৪টি দেশের সরকার আইএসও-র এজেন্ট হয়ে তদারকি করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের আর এক ধাপ্পা আইএসবিএন বই এবং পাবলিকেশনের জন্য আইএসএস নং ম্যাগাজিনের আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিং করে দিচ্ছে কোনো প্রকার আইনগত অথরিটি ব্যাতিরিকে। এরা বিশেষজ্ঞও নয় এবং বিষয়বস্তু নিয়েও কোনো মাথাব্যথাও নেই, শুধু পয়সার বিনিময়ে এই কাজ করে কোটি কোটি ডলার কামিয়ে নিচ্ছে। একই কর্মকাণ্ড করে চলেছে এই হালাল শংসাপত্রধারী সংস্থাও। সুপ্রিমকোর্ট দ্বারা অবৈধ ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে স্লটার অ্যাক্ট ১৯৫০ থেকে সেগুলিকে ধর্মীয় কারণে বৈধতা দেওয়া হয়ে আসছে। ২০১৭ সালে সুপ্রিমকোর্ট আদেশ জারি করেছেন যে বেআইনি স্লটার হাউসগুলি বন্ধ করতে ও স্বীকৃত স্লটার হাউসগুলির উপর নজরদারি করতে এনকোর্সমেন্ট কমিটি গঠন করে যন্ত্রণা দিয়ে পশুহত্যা বন্ধ করতে।

● হালালোনোমিক্স অমুসলমানদের জাতিগত নির্মূলিকরণের এক জঘন্য কর্মসূচি :

ভারতে হালাল মাংসের জোগান সরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে হওয়ার ফলে ক্রমশ হিন্দু কসাইজগৎ কর্মহীন হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে হালাল মাংসের উৎপাদকরা (মুসলমান সম্প্রদায়) বছরে ২৩.৬৪৬ কোটি টাকার মতো মাংস রপ্তানি করে এবং দেশে ৪০,০০০ কোটি টাকার মতো মাংস ব্যবসায় দখল করে আছে। হিন্দু কসাইদের পরিণামে দ্রারিদ্রতা।

হালালোনোমিক্স কীভাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে অন্য জাতিগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার উদাহরণ এই উপমহাদেশেই দেখতে পাওয়া যায়। ভারত থেকে ১৯৪৭ সালে পৃথক হয়ে পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশে হিন্দুদের জাতিগত অবলুপ্তি আসন্ন প্রায়। পাকিস্তান গঠনের অন্যতম উদ্যোগী তপশিলি নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ভাষাতেই দেখুন তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু আইনজীবী, ডাক্তার, দোকানদার, ব্যবসায়ী ইত্যাদিদের বয়কট বাধ্য করছে বেঁচে থাকার তাগিদে ভারতে চলে আসতে।

একই ঘটনা সিন্ধুপ্রদেশ, বালুচিস্তানেও হিন্দুদের টার্গেট করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন রাজ্যে ও শহরে এমনকী পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন বাজার ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং পেশা মুসলমানদের ক্রমশ দখলে চলে আসছে।

ন্যাশনাল পার্টি অব অস্ট্রেলিয়ার জর্জ ক্রিসটেনসেন দাবি করেন যে অস্ট্রেলিয়ার হালাল অর্থনীতির টাকা সেদেশে শরিয়তি আইন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের দেওয়া হয়। □

করোনার কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ন্যাটোর বাড়ি থেকে যুদ্ধ

শিতাংশু গুহ

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চটজলদি শেষ হয়ে যাবে বলে যারা ভেবেছেন, তারা এখন চিন্তিত, যুদ্ধ কি গড়াবে বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপ নেবে? রাশিয়া ও ফ্রান্সের পারমাণবিক সমরাস্ত্র ব্যবহারের হুমকি পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের চিন্তাকে দুশ্চিন্তায় পরিণত করেছে। পুতিন বলেছেন, কোনো দেশ ইউক্রেনের আকাশে বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে মস্কো তা সরাসরি সামরিক সংঘাত বলে মনে করবে। ন্যাটো বলেছে, নিষেধাজ্ঞা জারি করার কোনো ইচ্ছে তাদের নেই। যারা ভেবেছেন যে, ন্যাটো সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে, তারাও হতাশ হচ্ছেন। তারা বুঝতে পারেননি যে, ন্যাটো করোনার কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বাকযুদ্ধ করবে!

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কি ঠিক যুদ্ধ, নাকি যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা? পুতিন কী করতে চাইছেন? ইতিমধ্যে তিনি ইউক্রেনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং চেরনোবিল-সহ ইউরোপের বৃহৎ পারমাণবিক স্থাপনা কেন্দ্র দখল করে নিয়েছেন। ইউক্রেনে ১৫টি পারমাণবিক কেন্দ্র আছে, হয়তো তিনি সবগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন বা নেবেন। অনেকে ভেবেছেন যে, পুতিন সহজে ইউক্রেন দখল করবেন এবং দেশটিকে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করবেন। রাশিয়া তা করছে না, বরং গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছে। পুতিনের লক্ষ্য হয়তো ইউক্রেনকে নিরস্ত্র করা বা নিরপেক্ষ করা। রাশিয়া হয়তো ইউক্রেনকে দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধকালীন সুইজারল্যান্ডের মতো নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায়। বিশ্বের সব ধরনের সংঘাতে সবসময় নিরপেক্ষ থাকা ইউরোপীয় দেশ সুইজারল্যান্ড এবার 'নিরপেক্ষ' অবস্থান ত্যাগ করে সরাসরি রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

রাশিয়ার পারমাণবিক কেন্দ্রগুলো দখল নেওয়ার কারণ হয়তো এগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যাতে ভবিষ্যতে সেখানে পারমাণবিক সমরাস্ত্র তৈরি করা না যায়। রাশিয়া হয়তো ইউক্রেনকে দুর্বল করার জন্যে তিনভাগে বিভক্ত করবে এবং কিয়েভে মস্কোপন্থী সরকার বসাবে। স্মর্তব্য যে, আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত ইউক্রেনের সাবেক মস্কোপন্থী প্রেসিডেন্ট রাশিয়ায় অবস্থান করছেন। রাশিয়া সফলভাবে ইউক্রেনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভেঙে দিয়েছে। কিউবায় যে কারণে আমেরিকা ওয়ারশ'র সমরাস্ত্র ঘাঁটি করতে দেয়নি। একই কারণে রাশিয়া তাঁর দোরগোড়ায় ন্যাটোর ঘাঁটি গড়তে দেবে না। হয়তো এ কারণে যুদ্ধ শুরুর পূর্বাহ্নে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পূর্ব ইউক্রেনের দোনেৎস্ক এবং লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়।

ইউক্রেনে রাশিয়া কী করবে— এটি কঠিন প্রশ্ন? আফগানিস্তানের কথা রাশিয়া ভুলে যায়নি, সেখানে আমেরিকা নিজে যুদ্ধ জড়ায়নি, মুজাহিদিনদের দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে, ইউক্রেনে কি তাই হবে? পর্বতসঙ্কুল আফগানিস্তান আর ইউক্রেন এক নয়? এবারো আমেরিকা বা ন্যাটো যুদ্ধে যাবে না, ইউক্রেনিয়ানদের নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালাবে? ইতিমধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ ইউক্রেনিয়ান দেশ ছেড়েছেন, অধিকাংশ পোল্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছেন। মিডিয়া জানাচ্ছে, এদের কেউ কেউ নাকি গেরিলা যুদ্ধ করতে দেশে ফিরে গেছেন। পুতিন বলেছেন, ইউক্রেনের জনগণের কান্নায় তিনি বিচলিত নন, কারণ তিনি ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তানের মানুষের কান্না দেখে বড়ো হয়েছেন। ইউরোপিয়ানদের খণ্ডিত মানবতার জন্যে মায়াকান্নার প্রতি তিনি ধিক্কার জানান।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেন্সকি পুনরায় সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বলেছেন, 'আমি হেরে গেলে আপনারাও হেরে যাবেন'। এই যুদ্ধে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেন্সকি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তিনি ইহুদি— এই কথা প্রচারিত হওয়ায় অনেকে থমকে যাচ্ছেন। তাঁর বিপক্ষেও অনেক মানুষ। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, শিল্পী দিয়ে রাষ্ট্র চলে না! জেলেনস্কি একদা কমেডিয়ান ছিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা বলছেন, জেলেনস্কি কার্যত ইউক্রেনকে ধ্বংস করে দিলেন। দুর্বল ইউক্রেনকে শক্তিশালী রাশিয়ার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে মিত্ররা কেটে পড়েছেন। জেলেনস্কি এখন একা। মাঝে-মধ্যে গুজব রটছে যে তিনি পালিয়ে গেছেন। তাঁর শেষরক্ষা হবে বলে মনে হয় না। যুদ্ধশেষে ইউক্রেনে যিনিই ক্ষমতাসীন হন না কেন, তাঁর রাশিয়ার সঙ্গে আপোশ করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। মিত্ররা টাকা পয়সা

দিচ্ছে, অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে, তাতে শেষরক্ষা হবে কি?

যারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন, তাঁরাই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে পুতিনের পরাজয়ও দেখতে পাচ্ছেন। তা কি সম্ভব? এ যুদ্ধে রাশিয়া হারবে? তেমন ঘটলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ওয়ারশ জোটের পতনের পর সেটি হবে রাশিয়ার জন্যে আর এক বিপর্যয়কর অধ্যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার জন্যে মিখাইল গর্বাচভ ও ইয়েলিৎসিনকে দায়ী করা হয়। পুতিন কি রাশিয়াকে ন্যার্টোর হাতে তুলে দেবেন? মিডিয়ায় অনেক অবিশ্বাস্য সংবাদ আসছে। তবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে 'হাসিয়া উড়াইয়া' দেওয়াটা ঠিক হবে না। তিনি প্রায়শ বলে থাকেন, 'যে পৃথিবীতে রাশিয়া থাকবে না, সেই পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রয়োজন কী? ১৯৯৯ সালে পুতিন চেচনিয়াকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। ২০০৮-এ নির্মমভাবে জর্জিয়াকে কচুকাটা করেন। ইউক্রেনের এখন 'ত্রাহি মধুসূদন' অবস্থা। মিত্ররা জেলেনস্কিকে মই বেয়ে উপরে উঠিয়ে দিয়েছে, পুতিন এখন টেনে-হিঁচড়ে নামাবেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর বাৎসরিক 'স্টেট অব দি ইউনিয়ন' ভাষণে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সর্বাত্মক ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, পুতিন এখন একঘরে হয়ে গেছেন। এর মধ্যে যুদ্ধকালীন সময়ে নরেন্দ্র মোদী ও পুতিন টেলিফোনে কথা বলেছেন। সেই প্রেক্ষিতে ভারতীয়দের উদ্ধারের জন্যে ৬ ঘণ্টা যুদ্ধবিরতি হয়। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নাগরিকরাও অনেকে এ সময়ে ইউক্রেন ছাড়েন। মিডিয়া জানায়, ইউক্রেন থেকে ফিরে আসা এক পাকিস্তানি ছাত্র শুক্রবার পেশোয়ারে শিয়া মসজিদে বোমা হামলায় নিহত হয়েছেন। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, ইউক্রেন থেকে বাংলাদেশিদের উদ্ধারে ভারতের সাহায্য চেয়েছেন। জাতিসঙ্ঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ বা ভারত ভোটদানে বিরত ছিল, এটি সঠিক সিদ্ধান্ত। এতে কি আমেরিকা রাগ করবে? সম্ভবত নয়, কারণ আমেরিকার কাছে ভারতের প্রয়োজন আছে।

রাশিয়ার মুদ্রা রুবলের দাম রেকর্ড পরিমাণ কমেছে। সাময়িক ক্ষতি পোষাতে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 'কী ইন্টারেস্ট রেট' সাড়ে নয় শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করেছে। এ মুহূর্তে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক স্যাংশন দিয়ে যাচ্ছে। এমনকী ব্যক্তি পুতিন ও তাঁর 'ইনার সার্কেল'-র বিরুদ্ধেও স্যাংশন হচ্ছে। যুদ্ধে যাওয়ার আগে কি রাশিয়া এসব ভাবেনি? নিশ্চয় ভেবেছে। এর ডিপোজিট অর্থের পরিমাণ ৬৩০ বিলিয়ন ডলার। ইইউ যতই অর্থনৈতিক স্যাংশন দিক না কেন, নিজেদের প্রয়োজনেই বেশিদিন তা চালু রাখতে পারবে না। রাশিয়া সারা পৃথিবীতে ১০ শতাংশ এবং ইউরোপে ২০ শতাংশ তেল ও ৩০ শতাংশ গ্যাস সাপ্লাই দেয়। অর্থনৈতিক অবরোধে এসব বন্ধ হয়ে গেলে ইউরোপ, বিশেষত বাল্টিক দেশগুলো সমস্যায় পড়বে। এদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন আলোচনা চলছে, যুদ্ধ-বিরতি নিয়ে কথা হচ্ছে, যুদ্ধও চলছে। বেলারুশ এ যুদ্ধে সরাসরি রাশিয়ার পক্ষে নেমেছে। ব্রিটেন, জার্মানি, কানাডা, স্পেন-সহ ৩৬টি দেশ আকাশসীমা বন্ধ করেছে। ওয়াশিংটন-মস্কো হটলাইন চালু হয়েছে।

অনেকে এই যুদ্ধকে হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের সঙ্গে তুলনা করতে চাইছেন এবং পুতিনকে হিটলার। ওই অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে ২০১৫ সালে মস্কো-ইউক্রেন 'নিনস্ক চুক্তি' স্বাক্ষর করে। এক্ষণে ওই চুক্তি লঙ্ঘিত হচ্ছে। এই যুদ্ধে জাতিসঙ্ঘ একটি 'অনাথ আশ্রমের' ভূমিকা পালন করে। এ সময়ে সবচেয়ে আলোচিত প্রশ্নটি হচ্ছে, ১৯৯৪ সালে ইউক্রেন যদি এর পারমাণবিক সমরাস্ত্র ধ্বংস না করতো তাহলে কি এ ঘটনা ঘটতো? সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর ইউক্রেন পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হয়ে যায়। কিন্তু অর্থাভাবে পারমাণবিক সমরাস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপ তখন পরামর্শ দেয় ওইসব সমরাস্ত্র ধ্বংস করে ফেলতে। একই সঙ্গে এরা ইউক্রেনের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি দেয়। ইউক্রেন সকল পারমাণবিক সমরাস্ত্র ধ্বংস করে দেয়। গ্যারান্টি দেওয়া একটি দেশ রাশিয়া এখন ইউক্রেন গিলে খাচ্ছে, অন্যারা কেটে পড়েছে।

ট্রাম্প বলেছেন, আমি থাকলে এমনটা ঘটতো না। আমেরিকানরা ইউক্রেন ব্যর্থতার জন্যে বাইডেনকে দায়ী করছেন, বলছেন, অতি বৃদ্ধ বাইডেনের এত বড়ো আন্তর্জাতিক সংকট মোকাবেলার সামর্থ্য নেই। বাইডেন অবাস্তব স্বর্গীয় ভালোবাসার গল্প শোনাচ্ছেন। উলটো বক্তব্যও আছে। ইউরোপ-আমেরিকা স্যাংশন জোরদার করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব নিষেধাজ্ঞায় তেমন প্রভাব ফেলবে কি? আমেরিকা কি পুতিন সাম্রাজ্যকে ভেনিজুয়েলার মতো 'ক্রিমিনাল এন্টারপ্রাজি' হিসেবে গণ্য করতে পারবে? যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আমেরিকায় তেলের দাম হুহু করে বেড়ে চলেছে। নিত্য পণ্যের দাম আকাশ ছোঁয়া। নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে। অপর একটি মত হচ্ছে, এ যুদ্ধে সবচেয়ে লাভবান হবে আমেরিকা। অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে রাশিয়া দুর্বল হবে, ইউরোপ পিছিয়ে পড়বে। লাভ আমেরিকার। অন্যভাবে চিন্তা করলে রাশিয়া ও ইউক্রেন যদি ইইউ বা ন্যাটোতে ঢুকে পড়ে বা তাদের নেওয়া হয়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমেরিকা ও চীন? চীন কিন্তু তলে তলে কলকাঠি নাড়ছে!

এটা ঠিক ১৯৭১ সালের রাশিয়া আর ২০২২ সালের পুতিনের রাশিয়া এক নয়। ১৯৭১ সালে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, এখন রাশিয়া। এই পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে রাশিয়ার মিডিয়া কখনোই স্বাধীন ছিল না। বরং রাশিয়ার মিডিয়া এরশাদ আমলের মতো সর্বদাই 'মিয়া-বিবির বক্স' ছিল। এবার পশ্চিমা মিডিয়া কার বক্স? বিশ্ববাসী এবার পশ্চিমা মিডিয়ার চেহারাটাও দেখলো। উভয় পক্ষ এখন একে অপরকে 'গুজবের বাক্স' হিসেবে অভিহিত করছে।

রাশিয়ায় বিক্ষোভ হয়েছে, কারারুদ্ধ বিরোধী নেতা আলেক্সি নাভালনি বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিলেন। পশ্চিমা মিডিয়ায় সেটা বহুল প্রচার পেয়েছে। আসলে কি তাই? যুদ্ধের ডামাডোলে অনেক খবর আসছে, যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আল-জাজিরা তার ক্রেডিবিলিটি হারিয়েছে। শুনলাম, বাংলাদেশি নাবিকের মৃত্যুতে রাশিয়া দুঃখ প্রকাশ করেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এক ভদ্রলোক এ যুদ্ধকে বিবাহিত জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছেন— 'এক্ষেত্রে ইউক্রেন হচ্ছে স্বামী, স্ত্রী রাশিয়া আর পরিবার হচ্ছে 'ন্যাটো'। □

পুরন্দরপুরের রাত

তখন সিক্সে পড়ি। গরমের ছুটিতে গেলাম গ্রামের বাড়িতে। হুগলীর পোড়াবাজারের পুরন্দরপুরে, গ্রামের বাড়িতে থাকতেন ঠাকুমা ও বড়ো

পিসিমণি। সেখানেই আমাদের আদি বাড়ি। বাবার কাজের সূত্রে কলকাতায় থাকতাম। ছুটি পড়লে গ্রামের বাড়ি যাওয়া ছিল বাঁধাধরা।

তখনকার পুরন্দরপুর ছিল যাকে বলে অজ পাড়াগাঁ। বেশিরভাগই মাটির বাড়ি। ধানের খেত, বড়ো বড়ো গাছ। টইটম্বুর পুকুর। পুকুরের মাছ। শুক্রবারের হাট। সব মিলিয়ে বেশ হই-হই একটা ব্যাপার। সেবার আমি আর ছোড়দি নতুন কাকার সঙ্গে গেলাম। প্রতিবার মায়ের সঙ্গে যাওয়া হয়। মা এবারে রাঙাপিসির বাড়ি গেছেন মালদায়। আমাদের পৌঁছে দিয়েই পরের ট্রেনে কলকাতা ফিরবেন নতুন কাকা। ট্রেনে সকাল সকাল পৌঁছে গেলাম। টিপকলের জলে স্নান করে খাওয়া সারা হলো। নতুন কাকা রওনা দিলেন ট্রেন ধরতে। ছোড়দির সঙ্গী ছিল গল্পের বই। এবারও গল্পের বই পড়ে ছুটি কাটাবে। আমার এখানে অনেক বন্ধু। জয়ন্ত, রাজা, জোটে, ভোম্বল, ছোটকা। আরও অনেক নাম। বিকেলে জয়ন্তদের বাড়ি গেলাম। সামনের মাঠে একে একে সবাই জড়ো হলাম। কিন্তু কারও মধ্যে খেলার তাগিদ দেখলাম না। জিজ্ঞেস করায় ছোটকা জানালো গুপীতলার দাশুখুড়ো গত রাতে মারা গেছেন। দাশুখুড়োর ভালো নাম গদাধর হালদার। গ্রামের বেসিক স্কুলে পড়াতেন। তাঁর একমাত্র ছেলে ছোটোবেলায় জলে ডুবে মারা যায়। সেই থেকেই দাশুখুড়ো অস্বাভাবিক আচরণ করতেন। পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াতেন। খোকন খোকন বলে চিৎকার করতেন। আর বলতেন, 'আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে/সুয্যি গেছে পাটে'। দাশুখুড়োকে দেখে আমরাও খোকন খোকন বলে চেঁচাতাম। উনি উত্তেজিত হয়ে ছড়া আওড়াতেন। আমরা মজা পেতাম। সেই দাশুখুড়ো নেই শুনে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। বেশিক্ষণ আর বসলাম না। সন্ধে হয়ে আসছে। বাড়ি ফিরলাম। হঠাৎ ঝড় উঠলো। ঠাকুমা বললেন কালবৈশাখির ঝড়। বাড়ির আলোগুলো নিভে গেল। কারেন্ট চলে গেছে। খুব ভয় পেলাম। কেউ যেন বুকের ভেতরে হাতুড়ি পেটাচ্ছে। মনে হলো এ ঝড় নয়, দাশুখুড়োর তাণ্ডব। মরে গিয়ে হয়তো ভূত হয়েছে দাশুখুড়ো। গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে ঝড়ের রূপে। ঝড়ের তাণ্ডব শেষে বৃষ্টি নামলো। রাতের খাওয়া শেষ হলে যে যার ঘরে শুতে চলে গেল। আমি ঠাকুমার কাছে শুলাম। ঠাকুমা মেঝেতে বিছানা করে শুতেন। একলা খাটে শুতে আমার ভয় করছিল। অগত্যা শুতে হলো। কিন্তু ঘুম এলো না। ততক্ষণে বৃষ্টি ধরে এসেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। দাশুখুড়োর চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। অচেনা নিশাচর পাখির ডাক, পেঁচার ডানা ঝাপটানো, তক্ষকের কর্কশ চিৎকার সবমিলিয়ে দাশুখুড়োকে নিয়ে আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে দিল। হঠাৎ পায়ে কিছু একটা আঁচড়ে দিল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। পায়ে ছড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা টের পেলাম। হ্যারিকেনের আলো নিভে গেছে।

ঘরময় অন্ধকার। সরু গলার একটা শব্দ পেলাম। লোমশ কিছু একটা আমার গা ঘেঁষে চলে গেল। আমার বুকের ধুকপুকুনি দ্বিগুণ হয়ে গেল। আমি ঘামছি। দাশুখুড়ো হয়তো আমার কাছে বসে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। আমি যেন বোবা হয়ে গেছি। শেষে শরীরের সব শক্তি এক করে ভূত ভূত বলে চেঁচিয়ে ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরলাম। ঠাকুমা উঠে আলো জ্বালিয়ে দিলেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ''দাদুভাই কোনো ভয় নেই। ভূত বলে কিছু হয় না''। সে রাতে আর খাটে শুলাম না। ঠাকুমার কাছে মেঝেতেই শুয়ে পড়লাম। সকাল হলো। সারারাতের আতঙ্কে তখনো কাঁপছিলাম। বিছানায় শুয়ে আছি। শুধু রাতের কথাই ভেবে যাচ্ছি। এমন সময় 'মিয়াঁও' ডাক শুনে মাথার উপর কড়িকাঠের দিকে তাকালাম। ছোট্টো ছোট্টো পা বের করে একটা বিড়ালছানা আড়মোড়া ভাঙছে। বুঝলাম এই ছানাটিই রাতে কোনোভাবে আমার পায়ে এসে পড়েছিল। সরু গলার স্বরটা বিড়াল বাবাজিরই ছিল। নিমেষে আমার সব ভয় কেটে গেল। তাছাড়া দাশুখুড়ো মাস্টারমশাই ছিলেন। ভালোমানুষ তিনি। তিনি কেন ভূত হতে যাবেন? তবে আমরা যে ওনাকে খেপিয়ে মজা করতাম সেটা অন্যায় ছিল। সেদিনই ঠিক করেছিলাম, আর কখনোও কারো সঙ্গে এমন আচরণ করবো না।

@ নি চি

ভারতের বিপ্লবী

প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী

বিপ্লবী প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর জন্ম ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের কেলিশহর গ্রামে। বাবার নাম ঈশাণচন্দ্র চৌধুরী। স্কুলে পড়ার সময় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। অসহযোগ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় তাঁর পাঁচবছর কারাদণ্ড হয়। পুলিশের ডেপুটি সুপার ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিপ্লবীদের মনোবল ভাঙার জন্য জেলের মধ্যে যাতায়াত করতেন। কয়েকজন বিপ্লবী এই কুচক্রীকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। জেলের মধ্যেই ভূপেন নিহত হন। বিচারে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁর ফাঁসি হয়।

জানো কি?

- উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রধান নদী হলো নাগর, কুলিক ও মহানন্দা।।
- দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রধান নদী হলো আত্রাই, পুনর্ভবা ও টাঙ্গন।
- উত্তর দিনাজপুর জেলার দাড়িভিট হাইস্কুলে বাংলা শিক্ষকের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়।
- আন্দোলনে তাপস সরকার ও রাজেশ বর্মন পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান।
- দশম শ্রেমীর ছাত্র বিপ্লব সরকারের পায়ে গুলি লাগে।
- দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানার বটুনে আছে কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর জন্মভিটা।

ভালো কথা

বিরজু

একসময় আমাদের গ্রামে খুব সাপের উপদ্রব ছিল। ঢোড়া সাপ নয়। কেউটে, গোখরো এসব। সাপের কামড়ে গ্রামের কেউ মারা যায়নি। কিন্তু হাঁস-মুরগি মেরে ফেলত। সব ডিম খেয়ে নিত। কে যেন বলেছিল, বেজি পুষলে আর সাপ থাকবে না। তাই দাদু একটি বেজির বাচ্চা মাঠে কুড়িয়ে পেয়ে নিয়ে এসে পোষ মানিয়েছে। এখন ওটা ছ'মাসের। আমরা বিরজু বলে ডাকতেই ছুটে আসে। আমাদের বাড়ির সবাই ওকে খুব ভালোবাসে। সাপ দেখলেই গায়ের লোম ফুলিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ফ্যাঁস ফ্যাঁস আওয়াজ করে। তারপর সাপের মাথা কামড়ে ধরে মাথাটা থেঁতো করে ফেলে। ছ'মাসে শুধু আমাদের বাড়িই নয়, গ্রামেও আর সাপ দেখা যায় না। ঠাম্মা বলে, বেজির গায়ের গন্ধ পেলেই আর সাপ ত্রিসীমানায় আসবে না। দাদুর দেখাদেখি আরও তিনটে বাড়িতে বেজি পুষেছে।

বিনয় মাহাত, নবমশ্রেণী, কোটশিলা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) না ণ প্রা ক	(১) বি র হৃ দা য় ক দ
(২) ঙ্গ ল না ল	(২) রা রা হো চো ম ম

৭ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) অন্নপ্রাশন (২) ঔষধালয়

৭ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) সাগরসংগম (২) অক্ষরজ্ঞানহীন

উত্তরদাতার নাম

(১) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, মকদুমপুর, মালদা। (২) শ্রেয়সী ঘোষ, সেকেন্দারপুর, অমৃতি, মালদা। (৩) অর্ঘ্যদীপ মাহাত, বরাবাজার, পুরুলিয়া। (৪) দুর্জয় দেব, গঙ্গারামপুর, দঃদিনাজপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

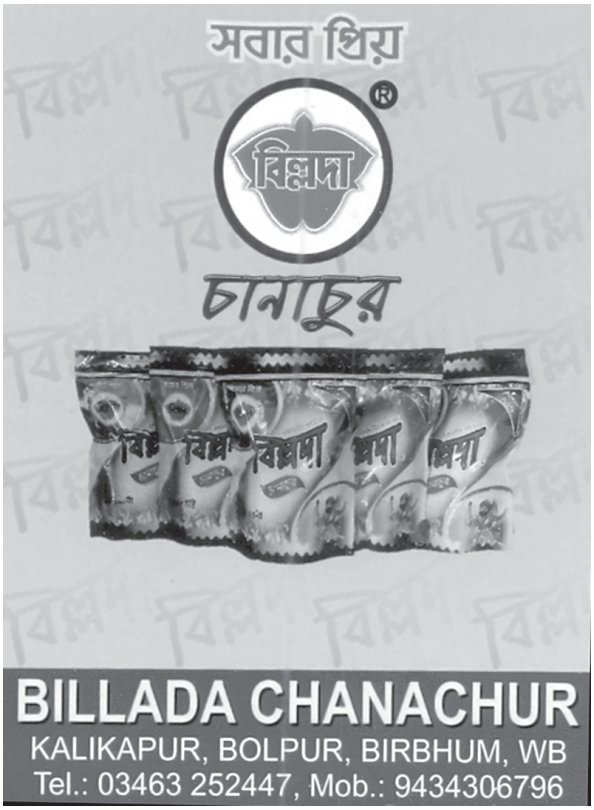

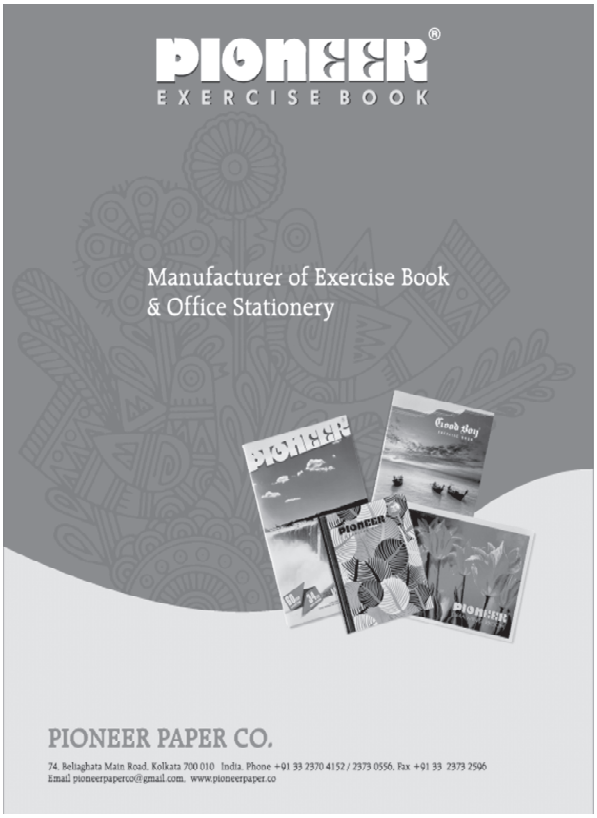

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

রূপকথার বোকাবুড়োর গল্প

মনে করিয়ে দেন অমাই মহালিঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি

তখন তাঁর বাইশ বছর বয়স। এক জমিদার তাঁর কাজে খুশি হয়ে উপহার হিসেবে একটুকরো জমি উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে। তবে জমিটা ছিল, একটা খাড়া পাহাড়ের ঢালে। রুখা-শুখা পাহাড়ি জমিটাতে জলের লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু অদম্য জেদ আর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের জোরে, সেই নিষ্প্রাণ পাথুরে জমিতেই সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ফেললেন তিনি। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারায় শস্যশ্যামলা হলো পাষাণ। তিনি অমাই মহালিঙ্গ নায়েক। যাঁর ইচ্ছাশক্তির জোরে উষর মাটি হলো সবুজ।

কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড়ে আদ্যানাড়কা গ্রাম। সেখানেই বাস কৃষক অমাই মহালিঙ্গ নায়েকের। যিনি রূপকথার সেই বোকা বুড়োর পাহাড় ভাঙার গল্পটাকে বাস্তবেও সত্যি করে তুলেছেন। তাঁর আদি পেশা ছিল শিউলির। তাল, খেঁজুর গাছে চড়ে রস সংগ্রহ করতেন। আর পরের জমিতে ভাগচাষি হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর নিজস্ব কোনও জমি ছিল না। একদিন গ্রামের জমিদারের কাছে দু' একর জমি পেলেন তিনি। কিন্তু খাড়া পাহাড়ি জমিতে জল না থাকায় চাষ করা ছিল অসম্ভব। তাছাড়া, পাম্পের সাহায্যে জল তুলে সেচ করার মতো টাকাও ছিল না। কিন্তু প্রকৃতির কাঠিন্য হার মানাতে পারেনি অমাই মহালিঙ্গকে। অনাবাদী ওই জমিতেই ফসল ফলানোর পণ করে বসলেন। একা হাতে পাঁচখানা সুড়ঙ্গ খুঁড়লেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র জলও উঠে এলো না। চার বছরের অমানুষিক পরিশ্রম বিফলে গেল। লোকে আড়ালে তাঁকে পাগল বলে উপহাস করতে শুরু করলো। তাও দমানো গেল না মহালিঙ্গ নায়েককে। ছেনি, হাতুড়ি, কোদাল নিয়ে ছ'বারের প্রচেষ্টায় অসাধ্যসাধন করে ফেললেন। অন্তঃসলিলা ধারা ভূগর্ভ থেকে উঠে এসে পাথুরে জমিকে ভিজিয়ে দিল। বিদ্যুৎ, পাম্প বা কোনও যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই কায়িক পরিশ্রমে জল সেচ করে ফসল ফলালেন অমাই মহালিঙ্গ। পাহাড়ের ঢালে ওই জমিতে সুপারি, নারকেল, কাজু, কলা ও গোলমরিচ উৎপাদন শুরু হলো।

অমাই মহালিঙ্গ নায়েকের পাঁচবারের ধারাবাহিক ব্যর্থতার পর যে লোকগুলো তার পিছনে উপহাস করে পাগল বলেছিল তাঁরাই এগিয়ে এসে তাঁকে ধন্য-ধন্য করতে লাগলো। ৭৬ বর্ষীয় এই কৃষক তাঁর গ্রাম আদ্যানাড়কা এবং তার আশেপাশের পাহাড়ি এলাকায় ৩০০টি ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ করেছেন।

কৃষি বিশেষজ্ঞ শ্রীপাদর দীর্ঘদিন ধরে মহালিঙ্গ নায়েকের কাজ পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি বলেন, 'অমাই মহালিঙ্গ শূন্য থেকে শুরু করেছিলেন। তাঁর নিরলস প্রকৃতি সাধনার ফলে গ্রামের নিষ্ফলা জমি সিঞ্চিত হয়েছে। অমাই মহালিঙ্গ নায়েকের অসাধ্য সাধনের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ২০২২ সালের পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করলো ভারত সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রেডিয়োতে তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ শ্রোতার সামনে তুলে ধরলেন মহালিঙ্গ নায়েকের অসামান্য কৃতিত্বের কথা। জলসম্পদ ও শক্তি দপ্তরের মন্ত্রী গজেন্দ্র সিংহ শাখাওয়াত, আদ্যানাড়কা গ্রামের ভূমিপুত্রের উদ্দেশে টুইট করে লিখেছেন, ' কী জীবন! কী কৃতিত্ব! কর্ণাটকের 'সিঙ্গলম্যান আর্মি' অমাই মহালিঙ্গ নায়েককে সম্মানিত করা হচ্ছে পদ্মশ্রীতে।'

এও এক উত্তরণের কাহিনি। আদিম বন্য যুগে আধুনিক মানুষের পূর্বসূরীরা যেভাবে বুদ্ধি ক্ষমতা ও পরিশ্রম দিয়ে প্রকৃতিকে জয় করেছিল, একই ভাবে রুক্ষতাকে জয় করে, একা হাতে পাহাড় খুঁড়ে ভূ-গর্ভস্থ জলের ধারা এনেছেন অমাই মহালিঙ্গ নায়েক।

তাঁর কথায়, 'নিষ্ফলা বলে কিছু হয় না। প্রাণের সমস্ত উপকরণই আছে ধরিত্রীর বুকে। সযত্নে অথবা শ্রমের মাধ্যমে সেই প্রাণের সন্ধান করতে হবে। ইচ্ছা শক্তি থাকলে প্রকৃতি নিজেই আপনার কাছে ধরা দেবে।' □

ফঃ ৬

রাশিয়ায় বিপ্লব সফল করার জন্য অর্থ জুগিয়েছিল জার্মানি

সমসাময়িক ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ হলো, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব ছিল ঘৃণ্য জার শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের একটি সংগঠিত বিদ্রোহ। পরিকল্পনা, নেতৃত্ব এবং বিশেষ করে অর্থ জোগান সম্পূর্ণ রূপে রাশিয়ার বাইরে থেকে এসেছে, বেশিরভাগই জার্মানি, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থদাতাদের কাছ থেকে।

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

ভূমিকা : রাশিয়ার মহান অক্টোবর বিপ্লব কমিউনিস্টদের বড়ো গর্বের জায়গা। কিন্তু সময় এসেছে রুশ বিপ্লব কতখানি খাঁটি মার্কসবাদী কমিউনিজমের শুদ্ধতা বজায় রেখে হয়েছিল তা খতিয়ে দেখার। এর মধ্যে পুঁজিবাদী ধনতন্ত্রের মদত ছিল কি? থাকলে কতটা?

রুশ বিপ্লব জার শাসকদের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকদের বিজয় হিসেবে ইতিহাসে চলে এসেছে। খুব কম লোকই জানেন যে জার্মান কাইজারও এতে জড়িত ছিলেন; তিনি ১৯১৭ সালে বলশেভিকদের সাহায্য করেছিলেন।

সূচনা : স্থান— জুরিখ, দিনাঙ্ক এপ্রিল ৯, ১৯১৭ : ৩২ জন রুশ অভিবাসী স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার জন্য ট্রেনে বসে অপেক্ষা করছিল। ট্রেনের একটি কামরায় অন্যান্য কমরেড-সহ স্বয়ং ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন বসে ছিলেন। জার্মান ও অন্যান্য কমিউনিস্ট- বিরোধীদের থেকে 'বিশ্বাসঘাতক, বখাটে, শূকর' এই সব চিৎকার ধেয়ে আসছিল কমিউনিস্ট যাত্রীদের দিকে। কিছুক্ষণের জন্য ট্রেন লাইন অবরোধ করেছিল কমিউনিস্ট-বিরোধীরা। সেখানে কমিউনিস্ট সমর্থকরাও তাদের স্লোগান 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল' গাইছিল। অবরোধ উঠলে ট্রেন চলে যায়।

কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম রাশিয়ান বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জার্মান চার্টার্ড ট্রেনটি পাঠিয়েছিলেন। জার্মান সাহায্যে লেনিন সুইজারল্যান্ডে তার নির্বাসন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং এক সপ্তাহ পরে তার গন্তব্য পেট্রোগ্রাডে পৌঁছান, পরে যার নামকরণ করা হয়েছিল লেনিনগ্রাদ। বর্তমানে আবার তা পরিবর্তিত হয়ে সেন্ট পিটার্সবার্গ হয়েছে।

বিস্তারিত

রাশিয়ায়, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় জার নিকোলাস সিংহাসন থেকে অপসারিত হয়েছেন। একটি অস্থায়ী সরকার আসীন ছিল। তবে অক্টোবর বিপ্লব তখনও দূর অস্ত।

লেনিন ১৯১৭ সালে পেট্রোগ্রাদে একটি বক্তৃতা দেন

'জার্মান বন্দুক ও রুশ সর্বহারার মুষ্ট্যাঘাত'

লেনিনের দেশে প্রত্যাবর্তন বার্লিনের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। জার্মানির শীর্ষ সেনা কমান্ড থেকে তাদের পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো বার্তায় বলা হয়েছিল— 'রাশিয়ায় লেনিনের প্রবেশই একটা সাফল্য। তিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করছেন'। কেন? লেনিনের প্রত্যাবর্তনে জার্মানির কী জাতীয় স্বার্থসিদ্ধি হবার ছিল?

এটা একটা রাজনৈতিক ধাঁধা। অনেকে মনে করেন কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম কমিউনিস্ট লেনিনের সঙ্গে আঁতাত করেছিলেন। জার্মান সম্রাটের লক্ষ্য ছিল জারতন্ত্রী সাম্রাজ্যকে দুর্বল করা কারণ রাশিয়ার সঙ্গে তথাকথিত কেন্দ্রীয় শক্তি— জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ১৯১৪ সাল থেকে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল।

বার্লিনের কৌশল পরিষ্কার, লেনিন এবং তার বলশেভিকদের দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে রাশিয়াকে অস্থির করা ও পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কমানো। জার্মান সাম্রাজ্য কূটনীতির এই পুরনো নিয়মের উপর নির্ভর করছিল, 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু'। সেই পরিকল্পনা কাজে লেগেছিল।

বিশাল ধনকুবের রাশিয়াবাসী ইহুদী পুঁজিপতি ইজরাইল লাজারেভিচ গেলফান্ড, রুশ বিপ্লবের নেপথ্য হোতা

এই ধারণাটির উদ্গাতা ছিলেন একজন রুশ ইহুদি। নাম ইজরাইল লাজারেভিচ গেলফান্ড; তাঁর কমিউনিস্ট ছদ্মনাম 'পারভাস', যার মানে ছোটো মানুষ। ১৯১৪ সালের শেষের দিকে তাঁর প্রভাব খাটিয়ে কনস্টান্টিনোপলে জার্মান রাষ্ট্রদূতকে একটি

জোটের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, গালভরা নাম দিয়েছিলেন, জার্মান বন্দুক ও রুশ সর্বহারার মুষ্ট্যাঘাত। তিনি দাবি করেছিলেন যে জার্মানি এবং রাশিয়ান বিপ্লবীদের স্বার্থ অভিন্ন!

পুঁজিবাদী এবং আর্মচেয়ার বলশেভিক

গেলফান্ড বিলাসী জীবনযাপন করতে এবং নারী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। তিনি ১৮৯১ সালে প্রথম জার্মানিতে আসেন, বিভিন্ন ছদ্মনামে বামপন্থী সংবাদপত্রের জন্য লিখতেন এবং সেদিনের সমস্ত নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল যেমন রোজা লুক্সেমবার্গ, কার্ল কাউটস্কি, লেনিন এবং লিও ট্রটস্কি। যাইহোক, কমরেডরা তার সমাজতন্ত্র বিরোধী জীবনধারার কারণে তাকে অবিশ্বাস করত।

২২ জানুয়ারি, ১৯০৫ তারিখে 'রক্তাক্ত রবিবারের' পর জারের ইম্পেরিয়াল গার্ড সেন্ট পিটার্সবার্গে বিক্ষোভকারীদের গুলি করে ২০০ জনেরও বেশি লোককে হত্যা করে। সেই সময়ে গেলফান্ড ও ট্রটস্কি দেশে ফিরে আসা প্রথম দিককার রুশ নির্বাসিতদের মধ্যে ছিলেন। তাঁরা কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু পরে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

গেলফান্ড আবার সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন কিন্তু পালাতে সক্ষম হন, কনস্টান্টিনোপলে একটি ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে ধনী হয়ে ওঠেন। তিনি একটা ব্যাঙ্কেরও মালিক ছিলেন, যার ফলে তাঁর পুরানো কমিউনিস্ট বন্ধুরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ট্রটস্কি 'জীবিত বন্ধুর জন্য শোকবার্তা'ও লিখেছিলেন।

তবে ১৯১৪ সালে যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব 'পারভাস'কে তার প্রভাব খাটাবার সুযোগ দিয়েছিল। কনস্টান্টিনোপলে জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে বার্লিনে পররাষ্ট্র দপ্তরে তাকে স্বাগত জানানো হয়।

২৩ পৃষ্ঠা রুশ বিপ্লব

এই রুশ কমিউনিস্ট, জার্মানিতে তার সাংবাদিকতার পটভূমি এবং কনস্টান্টিনোপলে ব্যবসায়িক সাফল্যের সুবাদে পররাষ্ট্র দপ্তরের জন্য একটি বিপ্লবের চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। মাত্র কয়েক মাস পরে যা ঘটবে তার জন্য এটা একটি রোডম্যাপ ছিল। ২৩টিরও বেশি টাইপ করা পৃষ্ঠায় গেলফান্ড বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন কীভাবে একটি বিদেশি-সমর্থিত অভ্যুত্থান সফল হতে পারে। তার কাছে বিপ্লব ঘুষ, নাশকতা এবং সরকার ফেলার প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এক মাস পরে জার্মান রাজকীয় কোষাগার 'রাশিয়ায় বিপ্লবী প্রচারকে সমর্থন করার জন্য ২০ লক্ষ জার্মান মার্ক অনুমোদন করেছিল'।

গেলফান্ড ব্যক্তিগত স্তরেও সক্রিয় ছিলেন। তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থ ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের মধ্যে কোনো তফাত ছিল না। তিনি ছিলেন ধ্রুপদী অর্থে যুদ্ধে মুনাফা লোটার মানুষ, প্রত্যেকটা জিনিস এবং প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে কারবার করতেন। অস্ত্র, ধাতু, কগনাক (খুব দামি ফরাসি ব্র্যান্ডি), ক্যাভিয়ার (দামি মাছের আচার), কাপড় সবকিছু তাঁর চাই। পূর্ব দিকের পথ যুদ্ধের কারণে অবরুদ্ধ ছিল, তাই তাঁর সহযোগীরা ফিনল্যান্ডের সীমান্তে একটি সুইডিশ গ্রামের মাধ্যমে পণ্য পাচার করত। সেটা তখন রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি মস্ত ডিউকের জমিদারি এবং সীমান্তরক্ষীদের ঘুষ দিয়ে অবৈধ কাজ চলত।

রুশ বিপ্লবীরা কেবল তাদের প্রচারের কাজে সমর্থন নয় তার চেয়ে বেশি কিছু পেয়েছিলেন জার্মানির থেকে। অস্ত্র ও ডিনামাইটও সীমান্ত অতিক্রম করে আসত। জার্মানির এই সব বদান্যতায় আর্কানগেলস্কে রুশ জাহাজগুলো ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং রাশিয়ার বন্দরগুলিতে আগুন লাগানো হতো। কোপেনহেগেনে জার্মান রাষ্ট্রদূত কাউন্ট উলরিখফন ব্রকডর্ফ-রান্টজাউ বিশ্বাস করতেন যে কমিউনিস্টদের সমর্থন করা ন্যায্য কাজ হবে যদি তা বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়া জোটকে ধ্বংস করতে কাজে লাগে। গেলফান্ডের সঙ্গে রান্টজাউয়ের বিশ্বাস মিলে গিয়েছিল।

হ্যাঁ জার্মানি রুশ বিপ্লবে অর্থ জুগিয়েছিল

গেলফান্ডের ধূর্ত পরিকল্পনা অবশেষে ফল দিল। ৭ নভেম্বর ১৯১৭, অক্টোবর বিপ্লব' হিসাবে ইতিহাসে একটি অভ্যুত্থান ঘটে। অন্তর্বর্তী সরকার ফেলে দেওয়া হয়, সোভিয়েত বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করে এবং রাশিয়া পরে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সঙ্গে সামরিক জোট বাতিল করে। কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম তার শত্রুকে দুর্বল করার জন্য আজকের অঙ্কে প্রায় আধ বিলিয়ন ইউরো (৫৮২০ লক্ষ মার্কিন ডলার) ব্যয় করেছিলেন।

গেলফান্ড জার্মান কাইজারের দালাল হিসেবে সরাসরি জড়িত ছিলেন। এই ব্যক্তি লেনিনের বিপ্লব সফল করতে সাহায্য করেছিল অথচ মৃত্যুর পর জার্মান মার্কসবাদী ক্লারা জেটকিন তাকে 'সাম্রাজ্যবাদের ব্যভিচারী' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। গেলফান্ড মাত্র ৫৭ বছর বয়সে ১৯২৪ সালে বার্লিনে স্ট্রোকে মারা যান। তিনি যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানি— দুই দেশই তা বেমালুম চেপে যায়!

লেনিন অল্পকালের জন্য রুশ কমিউনিস্টদের কাছে পুঁজিবাদী সমর্থন গ্রহণের কারণে নিন্দিত হয়েছিলেন, কিন্তু ১৭ জুলাই, ১৯১৮ সালে নাবালক পুত্র-সহ জার এবং তাঁর পরিবারের সব সদস্যদের কমিউনিস্টদের হাতে খুন হওয়ার পর তিনি বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। দলীয় সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন যে জার্মান অর্থের সাহায্যে তিনি বিপ্লব অর্জন করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়। নির্দ্বিধায় তিনি বলেছিলেন, এটাতো তিনি কখনও অস্বীকার করেননি। পরিবর্তে, তিনি জোর দিয়েছিলেন, 'আমি অবশ্য যোগ করতে চাই যে আমরা রাশিয়ার অর্থ দিয়ে জার্মানিতে একই রকম বিপ্লব ঘটাব।'

সুইজারল্যান্ডে নির্বাসন কালে লেনিন কিছু স্থানীয় সংবাদপত্র পড়ে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সম্পর্কে জানতে পারেন। লেনিন বলশেভিকদের প্রধান ছিলেন এবং এক সময়ে উপলব্ধি করলেন যে ইম্পেরিয়াল রাশিয়া ভেঙে পড়েছে। তিনি জানতেন এটি রাশিয়ায় ফিরে যাওয়ার সময়। তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, চলমান বিশ্বযুদ্ধের কারণে দেশে প্রবেশের অনেক পথ আটকে দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স তাঁর

রাশিয়ায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে গররাজি ছিল, কারণ তারা যুদ্ধের সম্পর্কে লেনিনের চিন্তাধারা জানত। তার মতে, বিশ্বযুদ্ধ ছিল একটা 'পুঁজিবাদী যুদ্ধ' যা কিছু লোকের সমৃদ্ধির জন্য সাধারণ জনগণকে সর্বস্বান্ত করছিল।

লেনিন যদি রাশিয়ায় ক্ষমতা লাভ করতেন, তাহলে তিনি রুশ ব্রিটেন-ফ্রান্সের সঙ্গে সামরিক জোট ভেঙে দিতেন ও যুদ্ধে তাদের সাহায্য করতেন না।

লেনিন বুঝতে পেরেছিলেন যে একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান হলো জার্মানির সঙ্গে আলোচনা। ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়া জোটের মতো জার্মানিও জানত যে লেনিন রাশিয়ার রাজনৈতিক মঞ্চে এক বিপজ্জনক ব্যক্তি। জার্মানি যদি পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে তাহলে পশ্চিমে তার সেনাবাহিনী বাড়ানোর সুবিধা হয়। কাইজার দ্বিতীয় উইলহেম সবুজ সংকেত দিয়েছিলেন এবং লেনিন ও অন্যান্য বলশেভিকদের একটি সিল করা রেলগাড়িতে জার্মানির রেলপথের যাত্রা সহজ করেছিলেন, আগে যেমন লেখা হয়েছে।

আগেই বলেছি দ্বিতীয় কাইজার উইলহেম বলশেভিক ষড়যন্ত্রকারীদের কয়েক মিলিয়ন মার্কও দিয়েছিলেন। ৯০ দশকে সাপ্তাহিক নিউজ ম্যাগাজিন 'স্টার্ন' একটি খবর উদ্ঘাটন করে তাতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, তারিখ এবং অর্থপ্রদানের পরিমাণ ব্যবহার করে দেখানো হয় যে রুশ বিপ্লব জার্মানদের অর্থে হয়েছিল। যাইহোক, এটি সম্পূর্ণ নতুন ছিল না, কারণ লেনিনের কিছু শত্রু ইতিমধ্যেই তাকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জার্মানি সবসময় এটা অস্বীকার করেছে, তবে এখনও কিছু প্রমাণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮ জুন, ১৯১৭-য়, একজন জার্মান শিল্পপতি সুইডেনে লেনিনের নামে একটি অ্যাকাউন্টে ৩,৫০,০০০ মার্ক পাঠিয়েছিলেন। ৮ জানুয়ারি, ১৯১৮-এ, ট্রটস্কিকে রিচসব্যাঙ্ক থেকে অর্থ পাঠানো হয়েছিল। কিছু ইতিবাসবিদ যুক্তি দেন যে জার্মানি লেনিনকে রাজনৈতিক সহায়তাও দিয়েছিল।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেন্ট পিটার্সবার্গে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ঘটেছিল। বিপ্লবটা রাশিয়ান সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে অবনতি হওয়ার কারণে হয়েছিল। বিশেষ করে খাদ্য সংকট ও কারখানায় কর্মপরিবেশের অবনতি হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন শিল্প শ্রমিকরা। রাশিয়াকে বিশ্বযুদ্ধের জন্য চরম মূল্য দিতে হচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়াকে তিনটি ভিন্ন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল— জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ও তুরস্ক। যুদ্ধটা কেবল সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বাস্তবিকভাবেও অত্যন্ত কঠিন ছিল। প্রধান সমস্যা ছিল রাশিয়ান দুর্বল রেলপথ।

এই বিপ্লবকে শুধু নীল কলার কর্মীরাই সমর্থন করেনি হোয়াইট- কলার কর্মী, ছাত্র এবং রুশ সংসদ ডুমার অভিজাত সদস্যরাও সমর্থন করেছিলেন। এইসব শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা ছিল মৌলিক। কারণ পূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবীদের কাছে ডুমার প্রয়োজন ছিল। অবশেষে, ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সফল হয়েছিল; আর দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করলে রুশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ফলত, এক দ্বৈত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; একদিকে, রুশদের অস্থায়ী সরকার, তার প্রতিনিধিরা ডুমায় বসতেন, অন্যদিকে ছিল পেট্রোগ্রাদ সোভিয়েত (রাশিয়া জুড়ে সোভিয়েতদের একটি বিস্তৃত মূল, বিশেষ করে শিল্প শহরগুলিতে) যা শ্রমিক এবং সৈন্যদের প্রতিনিধিত্ব করত।

সমসাময়িক ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ হলো যে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব ছিল ঘৃণ্য জার শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের একটি সংগঠিত বিদ্রোহ। আসলে পরিকল্পনা, নেতৃত্ব এবং বিশেষ করে অর্থ জোগান সম্পূর্ণ রূপে রাশিয়ার বাইরে থেকে এসেছে, বেশিরভাগই জার্মানি, ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থদাতাদের কাছ থেকে। তাছাড়া, রথসচাইল্ড সূত্র এই ঘটনাগুলি ঘটত একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।

জ্যাকবশিফ নিউইয়র্কের বিনিয়োগ সংস্থা কুহন, লোয়েব অ্যান্ড কোংয়ের প্রধান ছিলেন। তিনি বলশেভিক বিপ্লবের অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন এবং ট্রটস্কির নিউইয়র্ক থেকে রাশিয়া ভ্রমণে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ দিয়েছেন । কমিউনিস্ট নেতারা কখনই পশ্চিমি নেতাদের সঙ্গে ততটা শত্রুতা করেননি, যেমনটি বাগাড়ম্বর করে বলা হয়। তারা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পুঁজিপতি অর্থদাতাদের সঙ্গে বেশ সদভাব রেখে চলতেন এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন যখনই সেটা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেছে। বলশেভিক বিপ্লবকে আসলে লন্ডন এবং নিউইয়র্কের ধনী অর্থদাতারা অর্থ জুগিয়েছিল। বিপ্লবের আগে এবং পরে লেনিন এবং ট্রটস্কি এই অর্থদাতাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সেই লুকানো সংযোগ আজও অব্যাহত রয়েছে এবং মাঝে মাঝেই তা দেখা যায় যখন আমরা উদ্ঘাটন করি যে ডেভিড রককেফেলার মিখাইল গর্বাচভের সঙ্গে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বা কূটনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াই গোপন বৈঠক করছেন।

রুশ-ভাষী বিপ্লবীদের নিউইয়র্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এবং বন্দিদের মধ্যে প্যামফ্লেট বিতরণ করতে এবং তাদের নিজেদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচনা দিতে পাঠানো হয়েছিল।

উপসংহার

এই তহবিলের বিনিময়ে লেনিন জার্মানদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তিনি একবার রাশিয়ায় ক্ষমতা লাভ করলে, জার্মানি এবং তার মিত্রদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন। করেও ছিলেন তাই; এটা ঘটেছিল ৩ মার্চ, ১৯১৮-এ, যখন লেনিন ব্রেস্ট- লিটোভস্কের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন যা পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধের অবসান ঘটায়। বলাই বাহুল্য, ওইসব তহবিল ছাড়া ইউরোপের ইতিহাস সম্ভবত বেশ অন্যরকম হতো।

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

নারীকে খাঁচায় বন্দি করে রাখলে পিছিয়ে পড়বে বিশ্ব

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

বিশ্ব সৃষ্টিতে নারী আর পুরুষের সমান ভূমিকা। 'নারী' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম লিখছেন, 'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।' অপরদিকে 'মানসী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী—/পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি/আপন অন্তর হতে।' কবিতার শেষে গিয়ে তিনি বলছেন, 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।' এখানে পুরুষের চোখে নারী; কবির নিজস্ব মতামত। একটা 'আমি' এসে যাচ্ছে। তার মানে নারী কি অন্যের অধীন? সাপেক্ষ হয়েই বেঁচে থাকবে?

মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ যখন এই কবিতা লিখছেন তখন তিনি ৩৪ বছরের যুবক; ১৩০২ বঙ্গাব্দ, ঊনবিংশ শতাব্দীর একদম শেষে, বঙ্কিমের মৃত্যুর কিছু পরে। এই রবীন্দ্রনাথই তাঁর দ্বিগুণ বয়সে গিয়ে লিখলেন (১৯২৯) 'শেষের কবিতা'। সেখানে নারীর দুঃসাহসী যাত্রা শুরু করিয়ে দিয়েছেন, তাতে ৩৫ বছর আগেকার নারীকে আর চেনা যায় না, চেনা যায় না আগের রবি ঠাকুরকেও। লিখছেন, 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও। তারি রথ নিত্যই উধাও.../দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে/তোমা হতে বহুদূরে/মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে পার হয়ে আসিলাম.../ফিরিবার পথ নাহি/দূর হতে যদি দেখ চাহি/পারিবে না চিনিতে আমায়।/হে বন্ধু বিদায়।...'

এরও আট বছর পর 'কালান্তর' প্রবন্ধে (১৯৩৭) তিনি লিখছেন, 'নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে। প্রাণকে পোষণ করে।' রবীন্দ্রনাথ যখন 'মানসী' কবিতা লিখেছেন, প্রায় সমসাময়িক কালে স্বামী বিবেকানন্দ সিস্টার নিবেদিতাকে লিখেছেন, 'ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর— একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখন মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে।' তাতে সাড়া দিয়ে আঠাশ বছরের পূর্ণ যুবতী তেত্রিশের এক তরুণ সন্ন্যাসীর কাছে নিজেকে নিবেদন করলেন, বলা ভালো, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। বঙ্গদেশে নারী জাগরণ ও নবজাগরণে মহতী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

বৈদিক যুগ নারীবাদেরও সুবর্ণযুগ। ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা, শাশ্বতী, লোপামুদ্রা, প্রমুখ নারী ঋষির নাম পাওয়া যাচ্ছে; উপনিষদের যুগে সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদিনী নারী গার্গী, মৈত্রেয়ীর নাম জানা যায়; রামায়ণ-মহাভারতের যুগে মহিয়সী নারী সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গান্ধারী, কুন্তি, দ্রৌপদীর নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সন্ধান মেলে।

স্মৃতির যুগে কেন নারীর অবনতি হলো তার সামাজিক- রাজনৈতিক বিশ্লেষণ জরুরি। বামৈস্লামিক ইতিহাসকাররা সেই ইতিহাস সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেননি। বিদেশি শক্তির কাছে ভারতীয় সম্পদ কী শুধুই ধনদৌলত আর মশলাপাতি ছিল? তার সঙ্গে অবশ্যই ছিল ভারতীয় নারীর সুললিত দেহটাও। বিধর্মী-আগ্রাসনে নারী লুণ্ঠনের ভয়ংকর প্রবণতার জন্য যদি হিন্দু-সমাজপতিরা বাধ্য হয়ে থাকেন নারীকে পর্দানশিন করে রাখতে, তার জন্য হিন্দুধর্মকে এত গালমন্দ করার প্রয়োজন থাকে না। এই পরিবেশের মধ্যে থেকেও হিন্দুসমাজ যখনই সুযোগ পেয়েছে নারীর যথার্থ রূপ ফুটিয়ে তুলেছে; তাই দেখি বাঙ্গলার মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, মৈমনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রের অলোক-বন্দন।

মুসলমানি অন্ধকার যুগেও যখন সুযোগ ঘটেছে কোথাও কোথাও ঐশী সাধিকার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে 'ভক্তি- আন্দোলন'-কে কেন্দ্র করে। মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ, মুক্তাবাঈ, আক্কা, মহাদেবী, রানি ভবানী, খনা, লীলাবতীর মতো বিদূষী নারীরা জন্মেছেন ভারতবর্ষে।

> আমাদের সমাজে যেটা দরকার মেয়ে মানুষ থেকে মানুষ হওয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নয়, সামনের সারিতে উঠে আসা।

এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, 'He was the saviour of women.' তিনি নারীদের পরিত্রাতা; মাতৃভাবের পূজারি তিনি, মা ভবতারিণী তাঁর আরাধ্যা আর নারীরা সেই জগজ্জননীর প্রতিভূ। রানী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দেবালয়কে তিনি সাধনভূম বানালেন; তন্ত্র সাধিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণী হলেন তাঁর গুরু। সাগ্রহে সারদাদেবীকে গ্রহণ করে সাধনার জপমালা অর্পণ করলেন তাঁকে; কৃপা করলেন নটী বিনোদিনী, গৌরী মা, গোপাল মাকে।

আমাদের সমাজে যেটা দরকার মেয়ে মানুষ থেকে মানুষ হওয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক নয়, সামনের সারিতে উঠে আসা। মনে করানোর এই সংকল্প; নারীকে খাঁচাবন্দি করে রাখার বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব। পরিবারে নারীর উন্নতি না হলে পরিবারের উন্নতি হবে না; পরিবারের উন্নতি ব্যতিরেকে সমাজের উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়; সমাজের উন্নতি বিনা জাতির উন্নতি অসম্ভব। যারা ভূমির হাটের চাইতে নারীর হাট বেশি বিস্তৃত করতে চান, তারা সাবধান! লাভ-জেহাদের ছোবল থেকে ভারতীয় নারীকে বাঁচতে সহায়তা করুন; তাদের শারীরিক প্রশিক্ষণ দিতে বাবা-মাকে সহায়তা করুন; সর্বত্র ভারতীয় কন্যার মানসিক শক্তি বাড়াতে জাতীয়তাবাদী মানুষ এগিয়ে আসুন। □

ই-নমিনেশন ও আধার সংযোগের লক্ষ্যে পিএফ দপ্তরের ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে সেই উদ্যোগের আওতায় রয়েছে ভারত সরকারের এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন বা ইপিএফও দপ্তর। ওই উদ্যোগের আওতায় সারা দেশে পিএফ গ্রাহকদের অন্তত ৭৫ লক্ষের ই-নমিনেশন প্রক্রিয়া শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সেই কাজে জোয়ার আনতে দেশে প্রথম কাজ শুরু করলো পিএফ দপ্তরের পশ্চিমবঙ্গ রিজিওন। গত ৭ মার্চ হুগলির অ্যাঙ্গাস জুট মিলে সেই কাজ শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি সিকিম, আন্দামান ও নিকোবরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সেন্ট্রাল পিএফ কমিশনার রাজীব ভট্টাচার্য, সেন্ট্রাল ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য দিলীপ ভট্টাচার্য, আরপিএফসি-১ (হাওড়া) এস কে গুপ্তা ও অন্যান্য আধিকারিকরা। তিনদিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় ওই ক্যাম্প। গোটা দেশে ৭৫ লক্ষ ই-নমিনেশনের যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের টার্গেট ছিল প্রায় ৪ লক্ষ ২৫ হাজার। পিএফ দপ্তরের দাবি, ইতিমধ্যেই তারা সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে। অ্যাঙ্গাস জুটমিলের পাশাপাশি স্যাটেলাইট ক্যাম্প করা হয় রিষড়ার জয়শ্রী টেক্সটাইলসেও। দপ্তর সূত্রের খবর, ক্যাম্পে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে মহিলাদের ই-নমিনেশন ও আধার সংযোগে। প্রায় ৯৫ হাজার মহিলার ই-নমিনেশন ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। পিএফের ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নাম্বার বা ইউএনএনের সঙ্গে আধার সংযোগের কাজ ভবিষ্যতেও চালু থাকবে বলে দপ্তর সূত্রে খবর।

দেশের প্রথম ড্রোন স্কুলের সূচনা হলো গোয়ালিয়রে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের প্রথম ড্রোন স্কুলের উদ্বোধন হলো মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে। গত ১০ মার্চ আধুনিক প্রযুক্তির ড্রোন স্কুলের উদ্বোধন করেন দেশের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান। উদ্বোধনের পর শিবরাজ সিংহ চৌহান বলেন, 'ড্রোন প্রযুক্তি দেশের তরুণদের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে দিচ্ছে।' ওইদিন মধ্যপ্রদেশে পাঁচটি ড্রোন স্কুল খোলার কথা ঘোষণা করেছেন অসামরিক পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই গোয়ালিয়রে প্রথম ড্রোন স্কুলের সূচনা হলো।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে ড্রোন। আগে শুধুমাত্র সামরিক ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু অসামরিক ক্ষেত্রেও দিন দিন ড্রোনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ড্রোন প্রযুক্তি দেশের তরুণদের জন্য নিত্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করে দিচ্ছে। সেই সূত্রে গোয়ালিয়রে চালু হওয়া ড্রোন স্কুলে ড্রোন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর ফলে বাড়বে উপার্জনের সুযোগ। উল্লেখ্য কিছুদিন আগেই ১০০টি 'কিষান ড্রোনের' উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সময় তিনি জানিয়েছিলেন, প্রধানত কৃষিজমির উপর কীটনাশক ও নানাধরনের রাসায়নিক ছড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হবে এই ড্রোন। ড্রোন সেক্টরে আগামীদিনে ভারত বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে বলে জানিয়েছেন মোদী। সেই লক্ষ্যেই নয়া পদক্ষেপ কেন্দ্রের। দেশের তরুণদের মধ্যে ড্রোন স্টার্টআপ এখন নতুন ট্রেন্ড হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই ড্রোনের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে। খুব শীঘ্রই তা হাজার ছাড়িয়ে যাবে। এর ফলে আগামীদিনে এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেন, 'সরকার বাজেট ও নীতিগত পদক্ষেপে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশের তরুণ প্রজন্মের উপর আস্থা রেখে আমরা নতুন সম্ভাবনার দরজা খোলার চেষ্টা করলাম।' সেই পথেই এক কদম এগোলো দেশ। শুরু হলো ভারতের প্রথম ড্রোন স্কুল।

ভুলিয়ে দেওয়া ইতিহাসের স্মরণীয় চলচ্চিত্রায়ণ

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে তখন হয়তো অনেকেরই সিনেমাটা দেখা হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, তারা হয়তো এই প্রথম সিনেমা দেখতে গিয়ে নিদারুণ আতঙ্কিত এবং ব্যথিত হবেন। সিনেমাটির নাম দ্য কাশ্মীর ফাইলস। তবে একে নিছক সিনেমা না বলে চলচ্চিত্রায়িত ইতিহাস বলাই শ্রেয়। কারণ সিনেমাটির প্রতিটি ফ্রেমে রয়েছে রক্তাক্ত ইতিহাস। ১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারি কাশ্মীরে কী হয়েছিল অনেকেই জানেন, যাঁরা জানতেন না তাঁরা এই ছবি দেখে জেনে যাবেন। ছবির গল্প আবর্তিত হয়েছে মূলত পুষ্করনাথ পণ্ডিতকে ঘিরে, যিনি এবং যাঁর মতো অসংখ্য কাশ্মীরি পণ্ডিত পুরুষানুক্রমিক বাসভূমি ফেলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাধ্য করেছিল ইসলামিক জিহাদিরা। তাদের দাবি ছিল তিনটে— সব হিন্দুকে মুসলমান হতে হবে, নয়তো কাশ্মীর ছাড়তে হবে। না মানলে খুন হতে হবে।

পুষ্করনাথের পরিবার এবং আত্মীয়রা জিহাদিদের হাতে খুন হন। পুষ্করনাথ কাশ্মীর ত্যাগ করে শরণার্থী শিবিরে বসবাস করতে শুরু করেন। সারাজীবন ইসলামিক জিহাদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন পুষ্করনাথ। ৬ হাজার চিঠি লিখেছেন কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা রদ করার দাবি জানিয়ে। কেউই তার কথায় কর্ণপাত করেনি। পুষ্করনাথের নাতি কৃষ্ণ এই রক্তাক্ত অতীতের কথা জানতেন না। জেএনইউ-তে তে তার 'পণ্ডিত' পদবিটির জন্য তাকে যে অবমাননাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক। কালক্রমে কৃষ্ণ 'টুকড়ে টুকড়ে গ্যাঙের সদস্য হয়ে যায়। তারপর নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে আবার মূল স্রোতে ফিরে আসা। সত্যিই, অনবদ্য চলচ্চিত্রায়ণ। অসাধারণ অভিনয় মিঠুন চক্রবর্তী এবং অনুপম খেরের। ছাত্রদের মগজ ধোলাইয়ে সিদ্ধহস্ত এক বামনেত্রীর ভূমিকায় পল্লবী যোশী অপূর্ব। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় অখণ্ড নীরবতা পালন করা সাংবাদিকদের একেবারে নগ্ন করে দিয়েছেন পরিচালক। ছবি দেখতে দেখতে মনে হবেই, কেন এই সত্য আমাদের ইতিহাসে নেই? কেন আমাদের ইতিহাসে শুধু মুঘল সাম্রাজ্যের গল্প পড়ানো হয়? এরকম অনেক প্রশ্নের জন্ম দেবে এই ছবি। তথাকথিত ঐতিহাসিকদের কী প্রশ্ন করতে হবে তা জানার জন্যেও দেখতে হবে দ্য কাশ্মীরি ফাইলস।

মহারাষ্ট্রে কাশ্মীর ফাইলসকে করমুক্ত করার অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত ছবি দ্য কাশ্মীর ফাইলস। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের বিজেপি বিধায়ক নীতীশ রাণে ছবিটি করমুক্ত করার অনুরোধ জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে। মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠিতে নীতীশ রাণে লেখেন, বিনোদন কর রদ করা হলে টিকিটের দাম কমবে। তাতে অনেক বেশি মানুষ কাশ্মীরে হিন্দুদের ওপর কী নির্মম অত্যাচার হয়েছিল তা জানার সুযোগ পাবেন। বিশেষ করে ছবিটি যখন হিন্দুদের ওপর ইসলামি জিহাদিদের অত্যাচারের কথা প্রমাণ-সহ তুলে ধরেছে তখন তা করমুক্ত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশ সরকার ইতিমধ্যেই ছবিটাকে করমুক্ত ঘোষণা করেছে। ছবিটির পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী। প্রযোজক জি স্টুডিয়ো। অভিনয় করেছেন অনুপম খের, মিঠুন চক্রবর্তী, দর্শন কুমার, পল্লবী যোশী প্রমুখ।

सूर्या फाउण्डेशन

बी–3/330, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
दूरभाष : 011-25253681, 25261588
Email: suryafnd@gmail.com Website: www.suryafoundation.org

सूर्या स्कॉलरशिप स्कीम

सूर्या फाउण्डेशन पिछले कई वर्षों से तरुणों के समग्र विकास और उनके जीवन को सार्थक बनाने में लगा है। इसी प्रयास में **सूर्या स्कॉलरशिप स्कीम** के तहत होनहार तरुणों को **₹12000** से **18000** तक वार्षिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। पढ़ाई के साथ–साथ अन्य रुचियों के विकास में यह स्कॉलरशिप सहायक होगी। पिछले सालों में सैकड़ों युवा इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

योग्यताएँ – इस योजना के लिए वे सभी बालक / बालिकाएँ आवेदन कर सकते हैं जो प्रतिभाशाली, कर्मठ, चरित्रवान एवं संघ संस्कारों में पले–बढ़े हों तथा वर्ष 2022 में 10वीं या 11वीं या 12वीं की परीक्षा देंगे और जिन्होंने पिछली कक्षा में कम से कम 70% अंक प्राप्त किए हैं।

सूर्या स्कॉलरशिप स्कीम में चयन के लिए जो बालक / बालिकाएँ आवेदन करेंगे उनमें से चुने गए आवेदकों को स्कॉलरशिप पाने के लिए सूर्या फाउण्डेशन के ट्रेनिंग सेंटर सूर्या साधना स्थली दिल्ली में मई / जून माह में आयोजित 15 दिन का व्यक्तित्व विकास शिविर करना होगा। शिविर में आने–जाने का किराया, भोजन, आवास और प्रशिक्षण की सुविधा संस्था की ओर से होगी। स्कॉलरशिप के लिए अंतिम चयन व्यक्तित्व विकास शिविर में Performance के आधार पर होगा। चयनित शिविरार्थियों को ही प्रतिमाह स्कॉलरशिप दी जाएगी। **साथ ही सूर्या फाउण्डेशन के मापदण्डों पर खरे उतरने वाले शिविरार्थियों को फाउण्डेशन में Job के लिए भी Select किया जा सकता है।**

व्यक्तित्व विकास शिविर में Experts के द्वारा जीवनोपयोगी सत्र लिए जाते हैं। साथ ही व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से फौजी ट्रेनिंग, योग, ध्यान, मार्शल आर्ट, अन्यान्य खेल, दिल्ली दर्शन आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

आवेदन सूर्या स्कॉलरशिप स्कीम के लिए

(आवेदन पत्र अलग कागज पर हिंदी या अंग्रेजी में ही भरकर भेजें)

पूरा नाम ..... जन्मतिथि (अंको में) .....

पिता का नाम .....

पिता का व्यवसाय ..... परिवार की मासिक आय .....

भाई कितने हैं (आप को छोड़कर) ..... बहनें कितनी हैं ..... जाति ..... वर्ग .....

पढ़ाई का विवरण (Mark Sheet की फोटोकॉपी साथ जोड़ें) .....

अपना फोटो यहाँ चिपकायें

पत्र व्यवहार का पता .....

पिन कोड ☐☐☐☐☐☐ Mobile : .....

NCC / NSS / OTC / ITC / शीत शिविर / PDC (कोई शिविर किया है तो उल्लेख करें) .....

सेवा भारती / विद्या भारती / वनवासी कल्याण आश्रम के किसी विद्यालय / छात्रावास या संघ या परिषद् अथवा अन्य क्षेत्रों से संबंध रहा है तो कब और कैसे ..... दायित्व.....

सूर्या परिवार में कोई परिचित है तो नाम एवं विभाग .....

Email : .....

अपनी विशेष क्षमता, योग्यता, गुण एवं उपलब्धि अवश्य लिखें। इसके अतिरिक्त अपने विषय में कोई अन्य जानकारी देना चाहें तो अलग पेज पर लिखकर भेजें।

आवेदन की अंतिम तिथि : 30 अप्रैल, 2022